Estd. : 1830

Scottish Church College

DEPARTMENT OF SANSKRIT

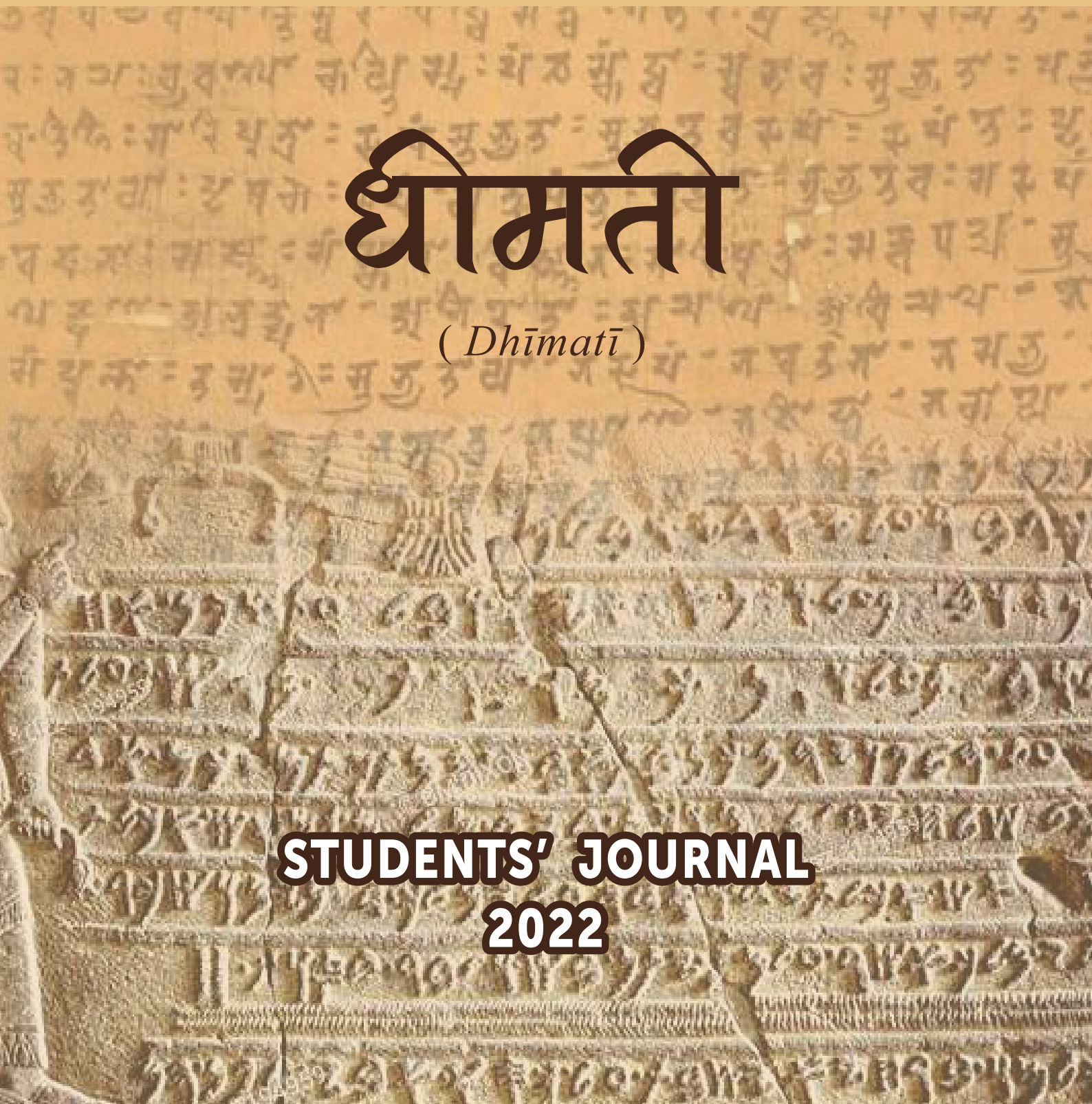

धीमती

(Dhīmatī)

STUDENTS' JOURNAL
2022

Estd. : 1830

Scottish Church College

DEPARTMENT OF SANSKRIT

धीमती

(Dhīmatī)

STUDENTS' JOURNAL

2022

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অধ্যক্ষের বক্তব্য		৬
উপাধ্যক্ষের বক্তব্য		৭
বিভাগীয় প্রধানের বক্তব্য		৮
সংস্কৃত ঐতিহাসিক সাহিত্য	হৈমী দত্ত	৯
মহাকবি কালিদাসের গীতিকাব্য	অনিমেষ হালদার	১৭
গল্পপ্রিয় ভারতীয়	অর্চিতা বণিক	২৫
অলঙ্কারশাস্ত্রে রসসিদ্ধান্ত	শ্রেয়া সরকার	২৯
ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের ইতিহাস	ঋষভ চক্রবর্তী	৩৮
প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চর্চা	অগ্নিভা ব্যানার্জী	৪৫
ইতিহাসের উপাদান রূপে অভিলেখ	মিলি মাজী	৫৬

Scottish Church College
(A Christian Minority Institution)
Parent Body: Church of North India

Estd. 1830

1&3 Urquhart SquareKolkata- 700 006
Ph: 033 2350 3862 Fax: 033 2350 5207
www.www.scottishchurch.ac.in
email *principal@scottishchurch.ac.in*

PRINCIPAL
Ph. 033 2350 3862, Ext.110
email: *scottish.cal@gmail.com*

শুভেচ্ছাবার্তা

স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃত বিভাগকে স্টুডেন্ট জার্নাল 'ধীমতী' প্রকাশনার জন্য বিশেষ সাধুবাদ জানাই। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয়সমূহকে অবলম্বন করে বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তত্ত্বাবধানে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের গবেষণামূলক প্রবন্ধরচনা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। আমি সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রয়াসকে বিশেষ প্রশংসা জানাই এবং এই প্রয়াস আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে আশা রাখি। সংস্কৃত বিভাগ আগামী দিনেও এরকম আরও প্রয়োজনীয় শৈক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে সমৃদ্ধ হোক এবং আগামীর জন্য প্রস্তুত হোক। সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পরমেশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

Principal
Scottish Church College
Kolkata

২৮/৫/২২

Scottish Church College
(A Christian Minority Institution)
Parent Body: Church of North India

Estd. 1830

1&3 Urquhart Square Kolkata- 700 006
Ph: 033 2350 3862 Fax: 033 2350 5207
www.www.scottishchurch.ac.in
email *principal@scottishchurch.ac.in*

VICE-PRINCIPAL
Ph. 033 2350 3862 Ext. 105
email: *scottish.cal@gmail.com*

From the Vice Principal's Desk

Students' seminars are extremely useful in the college life because they help students practice thinking. One who can think and express the thought in different ways is acclaimed and esteemed everywhere. Times are changing. Human values and sense of living have been appropriated by the regimes of information and technology in the last half a century. This is inevitable in a globalised world. But the simple thing of independent thinking can teach us not to accept anything and everything uncritically. That is where students' seminars can be useful beyond the limits of curriculum and formats. They give platforms to learners. I congratulate the students of Sanskrit Department for not only presenting papers in a seminar but also taking the trouble to publish them in a printed anthology. The themes of presentation are surey interesting ranging from Indian music or historical literature to Indian ayurveda or the art of storytelling. This practice should go on. I wish all the very best to the endeavour of the Sanskrit Department – the students and the faculty alike.

Dr. Supratim Das
28/05/2022

প্রাগুক্তি

স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃত বিভাগে প্রতিবছর বিভিন্ন আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে নিয়মিতভাবে। বিগত প্রায় পাঁচ বছর আগে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভাগে একটি স্টুডেন্ট সেমিনার আয়োজিত হয়েছিল। যেখানে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবিষয়সমূহ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে এক-একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিল। ছাত্রছাত্রীদের সেই প্রয়াসকেই সংবদ্ধ করে বিভাগের পক্ষ থেকে একটি প্রকাশনার পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিনের। মাঝে অতিমারী পরিস্থিতি ও অন্যান্য নানা কারণে সংকলনের কাজে বিলম্ব ঘটেছে। আজ ঐ ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে। তাদের সংক্ষিপ্ত গবেষণার ফসলগুলো সকলের সম্মুখে তুলে ধরার সদিচ্ছাতেই বর্তমান উদ্যোগ। এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আই.কিউ.এ.সি কো-অর্ডিনেটরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কলেজ গ্রন্থাগারের বিপুল সম্ভার এই সম্পাদনার কাজকে বহুলাংশে সহায়তা করেছে। মুদ্রণে সহযোগিতার জন্য ‘প্রয়াস’ সংস্থার কাছে ঋণী। সর্বোপরি, বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা উল্লেখনীয়।

বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রবন্ধগুলি সকলের সুখপাঠ্য হবে এই আশা রাখি।

ধন্যবাদ।

অরুন্ধতী দাস

বিভাগীয় প্রধান

সংস্কৃত ঐতিহাসিক সাহিত্য

হৈমী দত্ত

সংস্কৃত সাহিত্য বিপুলভাবে কাব্য, নাটক, কথা, আখ্যায়িকা, ছন্দঃ, অলঙ্কার, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের রচনাবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হলেও তুলনামূলকভাবে, ঐতিহাসিক কাব্যের অস্তিত্ব সংস্কৃত সাহিত্যে নগণ্য। Dr. A.B. Keith আক্ষেপের সুরে বলেছেন—''In the whole of the great period of Sanskrit literature there is not one writer who can be seriously regarded as a critical historian''. এমনকি সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি বাণভট্ট ব্যতীত অন্য কোন কবি-নাট্যকার বা আলংকারিকের জীবনী, আবির্ভাব কাল সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি না। বাণভট্টই কেবল স্বগ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই কারণেই বলা হয়—''History is the one weak point in Sanskrit literature''. সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাব্যের স্বল্পতার জন্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল—

(i) কোন জাতি ইহসর্বস্ব না হলে ইহকালের কোনকিছুকে ধরে রাখার চেষ্টা করে না। ভারতের মুনি ঋষিরা প্রচার করেছেন—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', 'ত্যাগাচ্ছান্তির্নিরন্তরম্' ইত্যাদি। ফলে প্রাচীন ভারতের মানুষ পরমাত্মার সন্ধানে এবং ভূমার মহানন্দ লাভের জন্য ব্যাপৃত থেকেছে। এইভাবে ইহকে অবজ্ঞা করাই মূলতঃ ভারতীয়দের ইতিহাস সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছে।

(ii) কোন জাতি ইতিহাস রচনার প্রেরণা লাভ করে তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ থেকে। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত জয়ের সময় পুরু ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় রাজা তাকে বাধা দান করেনি। এটি থেকে প্রমাণিত হয় ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধের অভাব ছিল, যা ইতিহাস সৃষ্টির অন্তরায়ই ছিল।

(iii) ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশও ইতিহাস রচনার অনুকূল ছিল না। ফলে সাল–তারিখের বিবরণ সহ রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করার মতো কোন ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেনি। অধ্যাপক কীথ মন্তব্য করেছেন— "It may be that India failed to produce historians because the great Political events which affected her during the Period upto A.D. 1200 did not call forth popular action." [A. B. Keith : HSL. p. 144-45] এছাড়াও S.N. Dasgupta মন্তব্য করেছেন— "India failed to produce, inspite of its abundance of intellect, History in modern sense."

কিংবদন্তীপ্রসিদ্ধ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ইতিহাস অভিধাটি অতি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে—

''पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रञ्चेति इतिहासः।" (অর্থশাস্ত্র ১।১।৫) সুতরাং, প্রাচীনদের আলোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃত 'ইতিহাস' শব্দটি আধুনিক ইতিহাস বা ইংরেজী History অর্থে সমার্থক নয়। ইতি-হ-আস (ইতিহাস) কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এমনই ছিল। কিন্তু শব্দটি কখনই শুধুমাত্র বাস্তব যথাযথ ঘটনা অথবা সত্য কাহিনী অর্থে গৃহীত হয়নি। বরং বলা যায়, প্রাচীন ঘটনা বা আখ্যান, কাহিনী, লোককথা বা কিংবদন্তী প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে যেরূপ অবস্থায় লক্ষ্য সবই ইতিহাস—

'इति हेत्यव्ययं पारम्पर्योपदेशाभिधायि।

तस्यामनमासोऽवस्थानमेताविति।। বিষ্ণুপুরাণ।।

পারম্পর্যোপদেশে স্যাদৈতিহ্যমিতি হাব্যয়ম্।। অমরকোষ।।

রামায়ণ-মহাভারতের লেখকদ্বয় স্বরচনাকে কাব্য, শাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করলেও এগুলি যথার্থ ইতিহাস নয়।

প্রাচীন আলোচকগণ ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন—মুনি-ঋষি ও অন্যান্য সকলের জীবনী আলোচনা ইতিহাস; ইতিহাসে ভবিষ্যৎ ধর্মের নির্দেশ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের ঘটনাবলীর তাৎপর্য উল্লেখ থাকে—

আর্ষাদিবহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্।

ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্মযুক্।। বিষ্ণুপুরাণ।।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উপদেশযুক্ত অতীত ঘটনাবলী ইতিহাসের বিষয়। সুতরাং পৌরাণিক ঐতিহ্যে ইতিহাস শুধু ঘটনাপঞ্জী নয়, তার মধ্যে ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ইঙ্গিত থাকে। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান বলতে আমরা বুঝি পুরাণের বংশাবলী, প্রশস্তি, প্রত্নলেখ, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যান্য উপকরণ এবং কতিপয় মূল্যবান গ্রন্থ। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিলালেখ, তাম্রলেখ ও ভূমিদান পত্র থেকে খ্রীষ্টপূর্ব শতক থেকে অর্বাচীন কাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত এবং প্রত্যক্ষ ইতিহাস গ্রন্থগুলি যথার্থ ঐতিহাসিক রচনা। এই গ্রন্থগুলিই নিম্নে আলোচিত হল—

ক. হর্ষচরিত

মহাকবি বাণভট্ট, হর্ষচরিত নামক একটি আখ্যায়িকা রচনা করেন যা ঐতিহাসিক কাব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই হর্ষচরিত ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।

বিষয়—তিনি প্রথম উচ্ছ্বাসের ভূমিকায় ২১টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা, সমকালীন সাহিত্যশৈলী, খ্যাত ও অখ্যাত অনেক প্রাচীন কবিদের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

তার পরবর্তী আড়াই উচ্ছ্বাস কবি নিজের বংশপরিচয় দিয়েছেন।

এরপর তিনি হর্ষবর্ধন ও তাঁর রাজত্বের বর্ণনা করেন।

পরবর্তী ৩য় ও ৪র্থ উচ্ছ্বাসে পুষ্পভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধনের হূণদের বিরুদ্ধে ও গুর্জর, সিন্ধু, গান্ধার, লাট, মালব দেশের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় বর্ণিত হয়েছে। এরপর প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে উজ্জয়িনীরাজকন্যা যশোমতীর বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। তাদের দুই পুত্র ছিলেন রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন ও এক কন্যা রাজ্যশ্রী।

প্রভাকরবর্ধনের ভগিনীপতি শিলাদিত্যের ৮ বছরের পুত্র ভণ্ডী ও মালবের রাজার দুই পুত্র কুমারগুপ্ত ও মালবগুপ্ত, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পালিত হন। এরপর মৌখরিরাজ অবন্তিবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র কনৌজরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ বর্ণিত রয়েছে।

এর পরবর্তী ৫ম উচ্ছ্বাসে রাজ্যবর্ধনের হূণদের বিরুদ্ধে অভিযান, হর্ষের রাজধানীতে আগমন, পিতার

অসুস্থতা, পিতার মৃত্যু ও মাতার আত্মহত্যা বর্ণিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে রাজ্যবর্ধনের রাজ্যে আক্রমণ, মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মাকে হত্যা, রাজ্যশ্রীর বন্দিদশা, হর্ষকে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করে ভণ্ডী ও ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা, জয়লাভ, গৌড়রাজ শশাঙ্কের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, গৌড়রাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে হর্ষের সংকল্প, বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহনাদের তাকে উৎসাহ দান। হর্ষকর্তৃক হস্তিবাহিনীর প্রধান স্কন্ধগুপ্তকে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুতের আদেশ এবং স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক ইতিহাসের নজির উপস্থাপন বর্ণিত হয়েছে।

৭ম উচ্ছ্বাসে হর্ষের সিংহাসনে অভিষেক, গৌড়রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পৌঁছানোর পর কান্যকুব্জ যাত্রার পথে ভণ্ডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাজ্যশ্রীর পলায়নের সংবাদ শুনে ভণ্ডীকে গৌড়াভিযানের নির্দেশদান ও রাজ্যশ্রীর সন্ধানে বিন্ধ্য অভিমুখে যাত্রার কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

৮ম উচ্ছ্বাসে হর্ষের বিন্ধ্যাচলে ভ্রমণ, ভিলপ্রধান শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতুর সঙ্গে আলাপ, ব্যাঘ্রকেতু কর্তৃক প্রেরিত এক ভিলযুবক নির্ঘাতের কাছ থেকে গ্রহবর্মার বন্ধু দিবাকর মিত্রের কথা শ্রবণ ও তাঁর সাথে সাক্ষাত্, রাজ্যশ্রী উদ্ধার, গৌড়রাজকে হত্যা না করা পর্যন্ত রাজ্যশ্রীকে তাঁর সঙ্গে থাকার পরামর্শ দান ও সর্বশেষে দিবাকর মিত্রের আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শিবিরামুখে গমনের মাধ্যমে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) বাণভট্টকৃত হর্ষচরিত একটি আখ্যায়িকামূলক ঐতিহাসিক কাব্য।

(ii) এটি ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।

(iii) এর প্রথম উচ্ছ্বাসের ২১টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি দেওয়ার পর আড়াই উচ্ছ্বাসে কবি নিজ বংশপরিচয় এবং তারপর ৩য় উচ্ছ্বাস থেকে ৮ম উচ্ছ্বাস পর্যন্ত হর্ষবর্ধনের রাজত্ব ও তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

(iv) হর্ষচরিতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

সমালোচকদের মতামত—কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন—বাণভট্ট ঐতিহাসিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করে হর্ষচরিত রচনা করলেও এটি মূলতঃ কাব্য, ইতিহাস এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। সমালোচক S. K. Dey মহোদয় মন্তব্য করেছেন—The some total of the story, lavishly embellished as it is, is no more than an incident in Harsa's career; and it can not be said that the picture is either full or satisfactory from the historical point of view.'' [Dasgupta and De : HSL, P-228]

আবার কেউ কেউ বলেছেন হর্ষচরিত শুধু বাণভট্টের বংশানুকীর্তন, আত্মচরিত ও সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজপরিবারের ইতিহাস নয়, তা তদানীন্তন নাগরিক, গ্রামীণ ও আরণ্যক লোকসমাজের বিশ্বস্ত দলিল। P. V. Kane মন্তব্য করেন—''The Harshacarita is of prime importance to the historian of ancient India. It contains a mass of information on the state of ancient Indian

society on the social and religious observances and practices on military organisation, on the actualities of life in camp and city, on the progress of medicine and the various arts and industries.''

রচনাশৈলী—হর্ষচরিতের রচনাশৈলী কাদম্বরীর তুল্য আড়ম্বরপূর্ণ; কাদম্বরী অপেক্ষা হর্ষচরিতে দীর্ঘসমাস ও জটিল বাক্যপ্রয়োগ ঈষৎ কম হলেও, অনুপ্রাস ও যমকের আধিক্য বেশী, শ্লেষের প্রয়োগ সুকঠিন। জটিল জমকালো গদ্যরীতির পাশাপাশি সরল ও স্বচ্ছন্দ গদ্যভঙ্গীও হর্ষচরিতে সুলভ। কিন্তু Keith বলেছেন—Bana's prose is an Indian wood where progress is impossible through the undergrowth until the traveller cuts out a path for himself, and where even then he is confronted by malicious wild beasts in the shape of unknown words to terrify him. [Keith–HSL p.–326]

হর্ষচরিত ছাড়া কেবল Xuan Zang প্রদত্ত বিবরণ থেকে হর্ষের জীবনের প্রায় সামগ্রিক বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনটি অভিলেখ থেকে হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক বেশি মৌলিক তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

(i) Sonipat copper seal [Fleet, Gupta Inscription, No.–52]

(ii) Banskhera copper plate of Harsa [(628 C.E.) El. Vol. IV. pp. 208ff]

(iii) Madhuban copper plates of Harsa [(631 C.E.) vol. pp. 67]

খ. রাজতরঙ্গিণী

রাজা জয়সিংহ (১১২৭—৫৯ খ্রীঃ) ও অলকদত্তের পৃষ্ঠপোষক কল্‌হণ রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। এটি সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি ১১৪৮ খ্রীঃ এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন এবং ১১৫০ খ্রীঃ তা সমাপ্ত করেন। কল্‌হণের পরবর্তীকালে সুলতান আমলে মুসলমান বাদশাহ্‌ণদের পৃষ্ঠপোষকতায় চারজন ঐতিহাসিক রাজতরঙ্গিণীর পরবর্তী চারটি অধ্যায় সংযোজন করেন। প্রথম জোনরাজ (জন্ম-১৩৮৩ খ্রী.) রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্রীবর রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় অধ্যায় ও প্রাজ্যভট্ট রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ অধ্যায় রচনা করেন।

কবিপরিচিতি—কল্‌হণ রাজা জয়সিংহ (১১২৭–৫৯ খ্রীঃ) ও অলকদত্তের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন চণ্‌পক, কাশ্মীররাজ হর্ষের (১০৮৯–১১০১ খ্রীঃ) বিশ্বাসভাজন অমাত্য এবং পিতৃব্য ছিলেন কণক, হর্ষের অনুরাগী বন্ধু ও বিশ্বস্ত পার্ষদ।

জোনরাজ ছিলেন তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অন্যতম। জোনরাজের ছাত্র শ্রীবর ছিলেন গুরুর ন্যায় বিচক্ষণ, বিদ্বান ও কবি এবং তিনি সঙ্গীত শিল্পীরূপেও অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন জৈন্–উল্-আবিদিন ও তাঁর পরবর্তী সম্রাট হাসান্ শাহ এবং মুহম্মদ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা। তিনি ছিলেন হাসান্ শাহের (রাজত্বকাল ১৪৭২–৮৪ খ্রীঃ) রাজদরবারের প্রধান সঙ্গীতশিল্পী।

বিষয়বস্তু

(i) কল্‌হণকৃত রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের ইতিহাস তথা ৮১৩–১১৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজবংশাবলীর পরিচয়, অগণিত রাজা মহারাজার যুদ্ধবিগ্রহ, কীর্তিকলাপ, রাজনৈতিক চক্রান্ত, স্বার্থপর ক্ষমতালোভীদের ষড়যন্ত্র, উচ্চস্তরের গণিকাসেবা, ব্যভিচার প্রবণতা, জনজীবনের কুসংস্কার, ভয়ভীতি প্রভৃতি অর্থাৎ কাশ্মীরের রাজবংশাবলীর তথ্য ছাড়াও সমকালীন ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(ii) দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণীতে অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম জোনরাজ সুলতান জৈন্‌-উল্‌-আবিদিনের (১৪২১-৭২ খ্রীঃ) অনুরোধে (১১৫০–১৪৫৯ খ্রীঃ) জয়সিংহ থেকে রাণী কোটা পর্যন্ত হিন্দু রাজন্যবর্গের ইতিহাস বর্ণিত করেন।

(iii) রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীবর (১৪৫৯–৮৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত কাশ্মীরের সুলতানী রাজবংশের ঘটনাপঞ্জী বিবৃত করেছেন।

(iv) রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাজ্যভট্ট ১৪৮৬–১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এরপর ১৫১৪ খ্রীঃ থেকে আকবরের শাসনকাল পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাসকে রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ অধ্যায়ের পরিপূরকরূপে অন্তর্ভুক্ত করেন শুক।

বৈশিষ্ট্য

(i) ঐতিহাসিক কাব্য রাজতরঙ্গিণী শান্তরসপ্রধান রচনা।

(ii) কল্‌হণকৃত রাজতরঙ্গিণীকে দুভাবে ভাগ করা হয়। পুরাবৃত্ত ও কিংবদন্তীনির্ভর প্রাচীন যুগ এবং প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত পরবর্তী যুগ।

(iii) কল্‌হণকৃত রাজতরঙ্গিণীর উপাদানগুলি হল—নীলমত পুরাণ, ক্ষেমেন্দ্রের নৃপাবলী, পদ্মমিহিরের রচনা, অভিলেখ প্রশস্তি, কুলপঞ্জী, লোককথা প্রভৃতি।

(iv) কল্‌হণকৃত রাজতরঙ্গিণী সরল ভাষা, স্বচ্ছ বাগ্‌ভঙ্গী, সূক্ষ্ম নিরীক্ষণশক্তি, কৌতুকবোধ, কবিত্বশক্তি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমন্বিত।

জোনরাজকৃত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণীর রচনাশৈলী খুব জটিল।

শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় অধ্যায়ের রচনাশৈলী অতি উৎকৃষ্ট ও ঘটনার বিবরণে প্রাণবন্ত।

রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ অধ্যায়ের পরিপূরক অংশ শুক কর্তৃক বিবৃত ইতিহাসের ঘটনাবলী বহুক্ষেত্রে সঙ্গতিহীন ও কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট।

ফার্‌সী অনুবাদ— কাশ্মীরী সুলতান জৈন্‌-উল্‌-আবিদিনের তত্ত্বাবধানে রাজতরঙ্গিণীর নির্বাচিত অংশের ফার্‌সী অনুবাদ হয়। তার নামকরণ হয়—বাহার-উল্‌-অসমর্‌। এরপর সম্রাট আকবরের আদেশে আবদুল কাদির্‌-অল্‌-বাদাউনি ১৫৯৪ খ্রীঃ পূর্ণাঙ্গ ফার্‌সী অনুবাদ করেন। পুনরায় জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মালিক হায়দার একটি সংক্ষিপ্ত ফার্‌সী অনুবাদ প্রণয়ন করেন ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে।

গ. নবসাহসাঙ্কচরিত

পদ্মগুপ্ত (নামান্তরে পরিমল) ধারা নগরীর অধিপতি মুঞ্জের অর্থাৎ নবসাহসাঙ্কের আজ্ঞা অনুসারে মুঞ্জের জীবনী অবলম্বনে আনুমানিক ১০০৫ খ্রীঃ নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন। তাঁর পিতা মৃগাঙ্কগুপ্ত বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জের সভাকবি ছিলেন।

বিষয়বস্তু—১৮টি সর্গ বিশিষ্ট এই ঐতিহাসিক কাব্যটির মূল আখ্যান হল সিন্ধুরাজ ও নাগরাজকুমারী শশিপ্রভার প্রণয় ও বিবাহ।

এর প্রথম সর্গে মঙ্গলাচরণ, প্রাচীন কবিদের প্রশংসা, কবিদের শালীনতা ও ঔদার্য সম্পর্কিত মতামত, রাজ্যাবলী ও রাজার বর্ণনা রয়েছে। দ্বিতীয় সর্গে রাজা কর্তৃক মৃগদর্শন। তৃতীয় সর্গে শশিপ্রভার হারলাভ, হংসদর্শন, হংসের প্রতি নায়কের উক্তি, রমাঙ্গদের বাক্য ও হংসের পশ্চাৎ অনুগমন। চতুর্থ সর্গে রাজা ও পাটলার সাক্ষাৎ ও রমাঙ্গদের উক্তি। পঞ্চম সর্গে শশিপ্রভাকে দর্শনের প্রস্তাব। ষষ্ঠ সর্গে রাজা ও শশিপ্রভার সাক্ষাৎ। সপ্তম সর্গে শশিপ্রভার সংলাপ্ অষ্টম সর্গে নাগরাজ্যে সিন্ধুরাজের আগমন। নবম সর্গে নর্মদাসংবাদ, দশম সর্গে রত্নচূড়ের যাত্রা। একাদশ সর্গে বঙ্কমহর্ষিকে দর্শন, দ্বাদশ সর্গে নাগরাজকন্যার স্বপ্নসমাগম, ত্রয়োদশ সর্গে বিদ্যাধররাজের আগমন, চতুর্দশ-পঞ্চদশ সর্গে নায়কের পাতালরাজ্য দর্শন ও পাতালগঙ্গায় অবগাহন। ষোড়শ-সপ্তদশ সর্গে নায়ককর্তৃক স্বর্ণপদ্মদর্শন ও পদ্মপ্রাপ্তি। অষ্টাদশ সর্গে সিন্ধুরাজকর্তৃক শশিপ্রভাকে লাভ ও সবশেষে গ্রন্থপ্রশস্তি।

রচনাশৈলী—এটি কালিদাসের রচনার তুল্য হৃদ্য ও প্রসাদমণ্ডিত। সমগ্র কাহিনীটি পৌরাণিক গল্পের কাঠামোয় সংগঠিত। এর মধ্যে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান অত্যন্ত নগণ্য। মহাকাব্যের সর্বাধিক উপাদান ও আড়ম্বর থাকলেও ভাব ও ভাষার সংযম লক্ষণীয়।

ঘ. বিক্রমাঙ্কদেবচরিত

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রথমভাগ অষ্টাদশ সর্গ সমন্বিত এই ঐতিহাসিক কাব্যটি রচনা করেন বিল্‌হণ।

কবি পরিচিতি—বিল্‌হণ ছিলেন কাশ্মীররাজ গোপাদিত্যর পূর্বপুরুষ তাঁর পিতা ছিলেন—জ্যেষ্ঠকলশ (মহাভাষ্যের টীকাকার) তাঁর মাতা ছিলেন—নাগাদেবী। তাঁর দুই ভ্রাতাও ছিলেন বিদ্বান ও গ্রন্থকার।

তিনি খোনমুখ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডাল্‌হরাজ্ কর্ণের সভাপণ্ডিত গঙ্গাধরকে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে রামচন্দ্র সম্পর্কে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। চালুক্যবংশীয় রাজা বিক্রমাঙ্কদেব (১০৭৬–১১২৭ খ্রীঃ) তাঁকে বিদ্যাপতি উপাধি এবং ছত্র ও গজ পুরস্কার দান করেন।

বিষয়বস্তু—বিক্রমাঙ্কের পূর্বপুরুষ চালুক্য থেকে বংশের বিবরণী শুরু হয়েছে। বিক্রমাঙ্কের পিতা আবহমল্ল, আবহমল্লের মৃত্যুর পর তাঁর তিনপুত্র সোমেশ্বর, বিক্রমাদিত্য ও জয়সিংহের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ, বিক্রমাদিত্যকর্তৃক চোলরাজের পরাজয় ও আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, রাজকুমারী চন্দ্রলেখার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, বসন্ত ঋতু, পুষ্পাবচয় ও জলকেলি, অনুজ জয়সিংহের উপদ্রব, বিক্রমাদিত্য কর্তৃক জয়সিংহকে দমন ও তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন, রাজার মৃগয়াযাত্রা, বিক্রমপুরীর প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ ও কাঞ্চীরাজ্য অধিকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

রচনাশৈলী—বিক্রমাঙ্কদেবচরিত সাহিত্যগুণমণ্ডিত, অনুপ্রাস ও শ্লেষ অলংকারে যুক্ত।

ঙ. পৃথ্বীরাজবিজয়

পৃথ্বীরাজবিজয় নামক ঐতিহাসিক কাব্যের রচয়িতা হিসাবে কাশ্মীরীয় কবি জয়ানককে অনুমান করা হয়। যিনি কাশ্মীর ত্যাগ করে আজমীরে পৃথ্বীরাজের রাজসভার এক সভাসদ ছিলেন।

বিষয়বস্তু—আলোচ্য অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মোট ১২টি সর্গে মধ্যযুগের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের পূর্বপুরুষদের কাহিনী ও তাঁর বিবাহ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এই কাব্যটির রচনাকাল যথাযথভাবে নির্দেশ করা সম্ভব না হলেও কাব্যটি ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর সমাপ্ত হয়েছে বলা যায়। কারণ মহম্মদ ঘোরী ১১৯০ খ্রীঃ প্রথম ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

খ্রী. পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরীয় বিদ্বদ্-গোষ্ঠীর বরেণ্য পুরুষ জোনরাজ কাশ্মীরের পণ্ডিত-মণ্ডলীর অনুরোধে পৃথ্বীরাজবিজয়ের টীকা রচনা করেছিলেন।

চ. গৌড়বধ বা গউড়বহো

কনৌজরাজ যশোবর্মার পৃষ্ঠপোষক বাক্পতিরাজ(বপ্পইরাঅ)কৃত গউড়বহো প্রাকৃত সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থটি রচিত হয়। বাক্পতিরাজ যশোবর্মার গুণগ্রাহী বিদ্বান্ সভাসদ্গণের অনুরোধে কাব্যটি রচনা করেন।

বিষয়বস্তু—১০০৮টি শ্লোকবিশিষ্ট এই কাব্যের ১–৬১টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ ও ভূমিকা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি করা হয়েছে। ৬২–৯৮টি শ্লোকে কবিলক্ষণ, কবিত্বের প্রশংসা, শব্দার্থের মাহাত্ম্য এবং ভবভূতি, ভাস, রঘুকার প্রভৃতি কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে। এরপর মূল ঘটনা অর্থাৎ যশোবর্মাকর্তৃক জনৈক মগধ-গৌড় রাজার পরাজয় ও নিধনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে হেমন্তের বর্ণনা, গ্রীষ্মকালে সৈন্যদের অবস্থা বর্ণনা, বর্ষার সমারোহ বর্ণনা, বিন্ধ্যপর্বত এবং বিন্ধ্যবাসিনীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, নারীদের বিলাসবিভ্রম, বারবনিতাদের জলক্রীড়া, অন্যান্য রাজাদের পরাজয়, বশ্যতাস্বীকার, করপ্রদান, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন, অন্তঃপুরবাসিনীদের আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য— (i) এই কাব্যটির ভাষা হল মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।

(ii) এই কাব্যটি আর্যা ছন্দে রচিত ১০০৮টি শ্লোকসমন্বিত ও সর্গ বা পরিচ্ছেদবিহীন, ছোটো-বড় কুলক অর্থাৎ শ্লোকসমষ্টি অনুযায়ী বিবিধ বিষয়ে বর্ণিত। এই কাব্যে প্রাকৃতজনের ভাষারূপে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতভাষার সপ্রশংস প্রয়োগ উল্লেখের দাবি রাখে।

ছ. রামচরিত

সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত একটি শ্লেষকাব্য ও ঐতিহাসিক কাব্য।

কবিপরিচিতি—গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত কবিপ্রশস্তি থেকে জানা যায় তাঁর পিতা ছিলেন প্রজাপতি নন্দী, রামপালের সন্ধিবিগ্রহিক অর্থাৎ প্রথম সারির রাজকর্মচারী। পিতামহ পিণাক নন্দী। তিনি বারেন্দ্রের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনের বৃহদ্বটু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ।

বিষয়বস্তু—রামচরিতে রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র এবং পাল বংশের রাজা রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের

কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। পালবংশের কাহিনী বিশেষতঃ রামপালের (১০৮৪—১১৩০ খ্রীঃ) কৃতিত্ব বর্ণনা মুখ্য এবং রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা গৌণ উদ্দেশ্য।

বৈশিষ্ট্য—(i) এটি একাধারে দ্বিসন্ধান অর্থাৎ শ্লেষকাব্য ও ঐতিহাসিক কাব্য।

(ii) এটি চারটি পরিচ্ছেদ ও ২২০টি শ্লোকসমন্বিত।

(iii) এই চারটি পরিচ্ছেদ আর্যা ছন্দে রচিত।

(iv) সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে 'কলিকাল-বাল্মীকি' ও এই কাব্যেকে 'কলিযুগ-রামায়ণ' বলেছেন।

এছাড়াও কয়েকটি ঐতিহাসিক কাব্য হল— (১) হম্মীরকাব্যে চৌহানবংশীয় রাজাদের প্রধানতঃ হম্মীরের ইতিহাস বর্ণিত, ১৪ সর্গ ও ১৫৭২ টি শ্লোকসমন্বিত নয়চন্দ্র সূরি কর্তৃক রচিত হম্মীরকাব্য।

(২) আকবরের অনুগত শূর্জন নামক জনৈক রাজার কাহিনী অবলম্বনে ২০টি সর্গবিশিষ্ট গৌড়ীয় কবি চন্দ্রশেখরকৃত শূর্জনচরিত কাব্য।

(৩) বিংশতি সর্গ বিশিষ্ট ময়ূরগিরির বাগুল রাজাদের (রাষ্ট্রৌঢ় থেকে নারায়ণশাহ পর্যন্ত) ইতিহাস বর্ণিত রুদ্রকবি-কৃত রাষ্ট্রৌঢ়বংশকাব্য।

(৪) অচ্যুত রায়ের বিজয়-অভিযান এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী বর্ণিত, ১২টি সর্গবিশিষ্ট, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ের সভাসদ কবি রাজনাথ ডিণ্ডিমকৃত অচ্যুতরায়াভ্যুদয় কাব্য।

(৫) কাশ্মীরীয় কবি শম্ভুকৃত কাশ্মীররাজ হর্ষের (রাজত্বকাল ১০৮৮–১১০০ খ্রীঃ) প্রশস্তিমূলক রাজেন্দ্রকর্ণপুর কাব্য।

(৬) আনুমানিক ১৭ শতকে, জয়রাম পাণ্ডে রচিত, শিবাজীর পিতা শাহাজীর রাজসভার বিবরণ প্রদত্ত রাধামাধববিলাসচম্পূ।

(৭) ১৬৯০ খ্রীঃ রচিত, রাজারামের রায়গড় থেকে জিঞ্জি পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার অভিযান বর্ণিত, কেশব পণ্ডিতকৃত রাজারামচরিত কাব্য ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কাহিনীগুলি ঐতিহাসিক আখ্যানের ভিত্তিতে রচিত হলেও, কাল্পনিক উপাদানে পরিপূর্ণ। সুতরাং, চরিতকাব্য ও প্রবন্ধগুলি ইতিহাস নয়, বরং ইতিহাস-আশ্রিত রচনামাত্র। এতত্সত্ত্বেও, আড়ম্বরপূর্ণ-কাল্পনিক অংশ বর্জন করে, যে ঐতিহাসিক উপাদানটুকু উপলব্ধ হয়, তার মূল্যও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অস্বীকার করা যায় না।

মহাকবি কালিদাসের গীতিকাব্য

অনিমেষ হালদার

ভূমিকা ঃ

ইংরেজীতে Lyric বা বাংলায় গীতিকাব্য যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দৃষ্টিতে সে অর্থে গীতিকাব্য বলে সংস্কৃতে পৃথক্ কোনো কাব্যবিভাগ নেই। ইংরেজীতে 'Lyric' কথাটি এসেছে 'Lyre' শব্দ থেকে যার অর্থ বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। Lyre বা বীণার মত তারযন্ত্রের সহযোগে যে গান গাওয়া হত তাতে ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতি, আনন্দ বা বেদনার আবেগ মিশে থাকত। 'Lyric' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হত এক বিশেষ অর্থের দ্যোতক রূপে। বর্তমানে সে অর্থ আর নেই, অর্থের প্রসার ঘটে এখন গান না হয়েও কেবল কবির ব্যক্তিগত ভাবনার উচ্ছ্বাসে রচিত কবিতা Lyric নামে পরিচিত। কবির ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ভাবনা Lyric-এর বিষয়বস্তু হলেও সহৃদয় পাঠক তার মধ্যে আপনার ভাবনারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে Lyric এর নামান্তর গীতিকবিতা অর্থাৎ যে কাব্যের দ্বারা গীতের উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাই হল গীতিকবিতা। গীতিকবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—''যে গান কানে যায় না শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাজে।" সুতরাং কবির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ, তা প্রেমের, বিরহের বা ভক্তির যাই হোক না কেন যখন গীতিময় কাব্যরূপ লাভ করে, তখনই তা গীতিকাব্যের সংজ্ঞা লাভ করে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে—''যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিন্তাভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অগেয় গীতকাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফূটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" (গীতিকবিতা)

V. Varadachari গীতিকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"A Lyric can therefore be an expression of a feeling, thought or sentiment whether it be of love, grief or devotion." (কবির স্বতঃস্ফূর্ত সেই হৃদয়াবেগ তখন ভাবের মূর্চ্ছনা জাগায় যা মানুষের অনুভূতির তন্ত্রীতেও প্রতিধ্বনি তোলে। এই গীতিকবিতার আবেদন কাব্যের আবেদন অপেক্ষাতে অধিক।) ''Its expression is spontaneous and it has an emotional appeal more emotional than a poem.'' (শুধু তাই নয়, গীতিকাব্য বা কবিতা পাঠ করার পরেও তার ভাবব্যঞ্জনা সমষ্টিগত চেতনার মধ্যে অনুরণিত হয়।) প্রখ্যাত ইংরেজ কবি Keats তাঁর ''Ode on a Grecian Urn'' কবিতায় প্রায় একই কথা বলেছেন—

''Heard melodies are sweet
But those unheard are sweeter.''

সংস্কৃত খণ্ডকাব্য বলে যে কাব্য-বিভাগ আছে তার মধ্যে গীতিধর্মিতা বিদ্যমান হওয়ায় এই খণ্ডকাব্যই গীতিকাব্যের আখ্যা লাভ করেছে। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে খণ্ডকাব্যের উল্লেখ করে বলেছেন—''**खण्डकाव्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारि च।**"

মহাকাব্যের ছোটো অংশরূপ এই খণ্ডকাব্য। এখানে মহাকাব্যের ব্যাপকতা থাকে না, থাকে না মহাকাব্যের নব নব বৈচিত্র্য ও ভাবৈশ্বর্য। তবে এতে স্বল্প পরিসরে একটি মূলভাবের কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে গীতিকাব্য ও সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের কিছুটা সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য গীতিকাব্যে বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের 'Lyric' নরনারীর দেহজ প্রেমকে কেন্দ্র করেই প্রধানতঃ আবর্তিত। এই পৃথিবীতে মানুষের যে জীবনধারা প্রবাহিত, সেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও সম্ভোগের বিষয়কে কেন্দ্র করেই পাশ্চাত্য কবিরা গীতিকাব্য রচনা করেন। মানবীয় প্রেমের সহায়িকারূপে প্রকৃতিও সেখানে হাজির। সংস্কৃত গীতিকাব্য কিন্তু এই বিষয়ে কেবল সীমাবদ্ধ নয়। এর সীমা বিস্তৃত ও ব্যাপক। পৃথিবী ছাড়িয়ে মোক্ষের দিকেও এর অভিসার।

সংস্কৃত গীতিকাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস স্পষ্ট না হলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদান দুর্লভ নয়। ঋগ্বেদের ঊষাসূক্তে গীতিকবিতার নিদর্শন স্পষ্ট। এরপর রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির পথ বেয়ে অশ্বঘোষ, কালিদাস, জয়দেব প্রমুখ কবিদের রচনায় গীতিকাব্যের মাধুর্য ও সঙ্গীতময়তা পরিপুষ্টি ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তবে এদের রচনা যথার্থ গীতিকাব্য কিনা এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

গীতিকাব্য রচনায় মহাকবি কালিদাস

সময়কাল

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি হলেন কালিদাস। কালিদাস বলতে আমরা শুধু এক ব্যক্তিকেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণ যুগকে বুঝি, যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাকবি কালিদাস। কবির জীবনকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা যেসব সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তাঁর জীবনকাল ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে নিরূপিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতকের কোন সময় কালিদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। মহাকবি কালিদাসের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল—
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।"

তবে কালনির্ণয় প্রসঙ্গে কিছু বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যিক। আলঙ্কারিক দণ্ডী (আনুমানিক ৭ম শতক) 'কাব্যাদর্শে' শকুন্তলার শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করেছেন। বাণভট্ট (৭ম শতক) হর্ষচরিতে (১।১৬) কবির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। রবিকীর্তির রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আইহোল শিলালেখ'তে (৬৩৪ খ্রীঃ) কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত আছে। বৎসভট্টির মান্দাসোর লেখের কতিপয় শ্লোকের সঙ্গে মেঘদূত ও ঋতুসংহারের শ্লোকের মিল আছে (৪৭ খ্রীঃ)। দার্শনিক কুমারিল ভট্ট (৮ম শতক) 'তন্ত্রবার্ত্তিক'-এ শকুন্তলার শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করেছেন। আচার্য বামন 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে কুমারসম্ভবের (১/৩৫) একটি শ্লোকের অন্তর্গত পদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কালিদাস সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী।

এছাড়া বহুল প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী কালিদাস উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। আবার কেউ মনে করেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গের (১৮৪-১৪৯ খ্রীঃ পূঃ) পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজত্বকালে কালিদাসের আবির্ভাব হয়।

ঋতুসংহার—

ঋতুসংহারকে খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এতে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত এই ছয় ঋতুকে ঘিরে কবিকল্পনার সমাহার শ্লোকবদ্ধরূপে সাজানো হয়েছে। এই কাব্যে ছয় ঋতুর জন্য ছয়টি সর্গ নির্দিষ্ট। মোটামুটি ভাবে দেড়শত শ্লোকে এই কাব্যখানি রচিত। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫২টি, ১৫৩টি এবং ১৫৮টি শ্লোকের সংখ্যা পাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত শ্লোকগুলিকে পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। এই কাব্যের ছয়টি সর্গ কবি বিভিন্ন ছন্দে রচনা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রাণীকুলের আচরণ, নিসর্গ জগতের রূপ বৈচিত্র্য ও মানবমনে তার প্রভাব নিখুঁতভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমিকের চোখ দিয়ে কবি বিশ্বজগৎ প্রত্যক্ষ করেছেন। শৃঙ্গার রসই এই কাব্যের মুখ্য রস।

এই কাব্যের প্রথম সর্গে কবি গ্রীষ্মের বর্ণনা করেছেন। দিনে প্রচণ্ড সূর্য, আরামদায়ক দিনান্তে রাত্রির আকাশে স্নিগ্ধ চাঁদ গ্রীষ্মের বৈশিষ্ট্য।

প্রচণ্ডসূর্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে।। (ঋতু.১/১)

জল পিপাসায় তালু শুকিয়ে উঠলে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে জলভ্রমে এ সময় অন্য বনের দিকে ছুটে যায় হরিণেরা '...বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভং নভঃ।' (১/১১)

মুখ নীচু করে ফণাধর সাপ ময়ূরের কাছাকাছি নির্বিঘ্নে বসে থাকে। তৃষ্ণার্ত হাতির পাল সিংহের আক্রমণের ভয় পায় না। সরোবরের জল সহ তলদেশের কাদা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে আর শূকরের দল কাদায় গা ডুবিয়ে শীতল হয়। হাতির পাল জলে নেমে সারসপাখি, মাছ, সব কিছুকে ভীতত্রস্ত করে জলে কাদায় সরোবর তোলপাড় করে তোলে।

পরস্পরোৎপীডনসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দকর্দমম্। (১/১৯)

সিংহ, হাতি, গবয় শত্রুতা ভুলে একসঙ্গে নদীর জলে গা ডোবায়। এছাড়া সুখী মানুষের রাত্রিবেলা গান বাজনা করে প্রিয়া সমাগমে কেটে যায়।

এর পরেই আসে বর্ষাঋতু। জলভরা মেঘ যেন উন্মত্ত রাজহস্তী, বিদ্যুৎ যেন রাজকীয় পতাকা, বজ্রনাদ যেন মাদলের ধ্বনি।

সসীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তডিৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে।। (২/১)

সারা আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ অবিরাম বৃষ্টিধারা পাতের মধুর শব্দ কানে বাজে। ময়ূরের দল পেখম তুলে নাচতে শুরু করে (২/৬)। গাছে গাছে নতুন পাতা জন্মায়, তীরবেগে নদীগুলি সমুদ্রের দিকে ছুটে চলে। শীতল বাতাস কদম্ব, অর্জুন, কেতকী ফুলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টিধারার তীর ছুঁড়ে প্রবাসী পুরুষের হৃদয়কে সে বিরহব্যাকুল করে তোলে।

...সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্।। (২/৪)

ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রিতে চকিত বিদ্যুৎপ্রবাহ পথ আলোকিত করে অভিসারিণী প্রেমের যাত্রা সুগম করে।

...তডিত্প্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ।। (২/১০)

এর পরেই শরতের আগমন যেন নববধূর মতো। প্রস্ফুটিত পদ্মফুল তার মুখমণ্ডল, ঈষৎপক্ক শালিধানের নুয়ে পড়া গাছ তার শরীর, কাশফুল বস্ত্র এবং হংসরব নূপুর ধ্বনি। (৩/১)

রজত, শঙ্খ কিংবা পদ্মের মতো সাদা শতখণ্ড মেঘের চামর দুলিয়ে যেন তখন আকাশের রাজার বিশ্রাম চলে। বন্ধুক ফুলের রেণু মেখে মাটি রক্তিমাভ হয়, কৃষিক্ষেত্রে পাকা ফলম ধানের গাছে পড়ে যায়, ফুলের ভারে ফুলগাছ নুয়ে পড়ে, হংসমিথুন পদ্মফুল আর তরঙ্গের শোভায় সরোবর সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। একদিকে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম আর রাজহংস, অন্য দিকে নির্মল আকাশে চাঁদ আর তারার সমাবেশ। মনে হয় আকাশটাও যেন সরোবর।

...শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্।। (৩/২১)

গ্রামের চারিদিকে পরিপক্ক শালিধান, প্রস্ফুটিত লোধ্র, বিলীন পদ্ম আর শিশিরপাতের কাল নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্তের। ঘাসের ডগায় তখন ঊষার শিশিরবিন্দু অশ্রুকণা হয়ে ঝরে পড়ে।

...তৃণাগ্রলগ্নৈস্তুহিনৈঃ পতদ্‌ভিরাক্রন্দ্রতীবোষসি শীতকালঃ।। (৪/৩)

সরোবরের জল তখন প্রসন্ন ও সুশীতল। সকালের মিষ্টি রোদে ঘুমের আমেজে আলুলায়িত কুন্তলা কোন যুবতির ছবি তখন দুর্লভ নয়।

হেমন্তের পরে আসে শীত। তখন মানুষ চায় দরজা, জানলা বন্ধ করা গৃহকোণ, আগুন, সূর্যকিরণ, পুরু শীতবস্ত্র এবং অবশ্যই প্রিয়জনের সঙ্গ।

নিরুদ্‌ধবাতায়নমন্দিরোদরং হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরুণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ প্রযান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্।। (৫/২)

শীতের দীর্ঘরাত্রি সাধারণভাবে মানুষের প্রিয় হয় না। রাতের বিস্রস্ত সাজ ছেড়ে তরুণীরা সূর্যোদয়ের সময় চোখে মুখে নতুন প্রসাধন সজ্জা নেয়।

সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি। (৫/১৫)

স্বর্ণপদ্মের রঙের দেহকান্তি, তামার মতো ঈষৎ রক্তাভ ঠোঁট, আকর্ণ বিস্তৃত টানা চোখ, খোলাচুলে লেগে থাকা জলকণায় মুখের প্রতিবিম্ব —সব মিলিয়ে শীতের সকালে কোন নারীকে গৃহস্থঘরে স্থাপন করা লক্ষ্মীর মূর্তি মনে হয়।

...শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোঽদ্য।। (৫/১৩)

শালিধান, আখ আর প্রচুর গুড়ের খাবার শীতকালকে অন্যভাবে বিশিষ্ট করেছে।

প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ... (৫/১৬)

ষষ্ঠ সর্গে বসন্তের আগমন ঘটে যোদ্ধার মতো। (৬।১)

এ সময় সবই সুন্দর। গাছে গাছে ফুল, জলে পদ্ম, বাতাসে সুগন্ধ, দিন ও সন্ধ্যা রমণীয়, যৌবন মিলনোৎসুক।

দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।। (৬/২)

এরই সঙ্গে আছে মনোরম জ্যোৎস্না, কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের গুঞ্জন, বস্তুতঃ বসন্তকাল হল প্রেম উদ্বোধনের ঋতু। যুবতিচিত্ত তখন এমনিতেই অনুরাগরক্ত, কুলবধূ সংযমী ও মুনিরও বুঝি সংযম যায়। (৬।২৫)

পুরুষ হৃদয় তখন নারীর অধিকারে, প্রবাসী পুরুষেরা তো মূর্চ্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা (৬।৩০)। আমগাছের শাখায় শাখায় নবপল্লবও নারীহৃদয়কে আকুল করে তোলে। এ সময় দিনের বেলায় গাছের ছায়া ও রাত্রিতে জ্যোৎস্না সমান উপভোগ্য মনে হয় (৬।১১)। বসন্তের কোকিলের কূজন স্ত্রীলোকের মধুর বচনকেও হার মানায়, কুন্দফুলের শোভায় হার মেনে যায় তরুণীর স্মিত হাসি। তার কচি পাতার রঙে পরাস্ত হয় রমণীদেহের সৌন্দর্য (৬/৩১)।

সমালোচনা

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসই প্রথম কবি যিনি একত্রে ছয় ঋতুর বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যের শ্লোকগুলির মধ্যে কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। নেই কোনো আখ্যায়িকার সূত্র। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবুও এদের সম্মিলিত রূপের একটা সৌন্দর্য আছে, প্রত্যেকটি ঋতুর সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে ওঠে শ্লোকসমষ্টিতে। মহাকবি যেভাবে ঋতুর বর্ণনা করেছেন বৈদিক কবিরা ঋতুর এমন চিত্র পরিকল্পনা করেননি, রামায়ণে ঋতু বর্ণনা আছে, সীতার অপহরণের পর বিরহী রামের দৃষ্টিতে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা করেছেন আদিকবি বাল্মীকি। কালিদাস নিঃসন্দেহে আদিকবির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু উভয় বর্ণনায় পার্থক্য বিস্তর। পরিবর্তনশীলা প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ বাল্মীকি প্রকৃতি প্রেমিকের চোখে তার নানা রঙের রূপ এঁকেছেন, কিন্তু কালিদাস মূলতঃ কামিজনের চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃতির বিলাস বৈচিত্র্য, আসক্তি উদ্দীপনার প্রকাশ উজ্জ্বল দীপ্ত প্রভার মতো ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ঋতুসংহার' এই গ্রন্থটি কালিদাসের রচনা কিনা এ বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল—i) সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রে কোনো অলঙ্কারের উদাহরণ দেখানোর জন্য কোনো আলঙ্কারিক ঋতুসংহার থেকে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত করেননি, ii) এর ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের ভাষার মতো নয়, iii) মল্লিনাথ কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের টীকা রচনা করলেও ঋতুসংহারের টীকা রচনা করেননি। iv) বছরের আরম্ভ বসন্ত ঋতু থেকে, অথচ গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে ঋতুসংহারের আরম্ভ ইত্যাদি।

Keith কিন্তু এই যুক্তির প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে কোনো কবির প্রথম বয়সের রচনা ও পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাতেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। মূলতঃ ঋতুসংহার কবির তরুণ বয়সে সৃষ্ট। মল্লিনাথ এই কাব্যের টীকা রচনা করেন নি। তার কারণ এই কাব্যের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। গ্রীষ্ম বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ হওয়াতেও কোনো অসঙ্গতি প্রকাশ পায়নি। কারণ কালিদাস কাব্য রচনা করেছেন, গতানুগতিকতা তাঁকে মানতেই এরূপ হবে বাধ্যবাধকতা তাঁর ছিল না।

Keith দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন সে যদি ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনাবলী থেকে বাদ দেওয়া হয় তবে মহাকবি কালিদাসের যশ অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়বে।

মেঘদূতম্

কালিদাসের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা মেঘদূত। মন্দাক্রান্তার ধীরললিত গম্ভীর বিন্যাসে প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় গীতিকাব্যের সাম্রাজ্যে অতুলনীয় গৌরববাহী। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ দুই খণ্ডে মোটামুটি (৬৩+৫২)=১১৫টি শ্লোকে নিবদ্ধ খণ্ডকাব্য মেঘদূত। এই কাব্যের শ্লোকসংখ্যা

নিয়ে অবশ্য নানা বিতর্ক আছে। জিনসেনের 'পাশ্বাভ্যুদয়' কাব্যে মেঘদূতের ১২০টি শ্লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। টীকাকারদের মধ্যে বল্লভদেব ১১১টি, দক্ষিণাবর্তনাথ ১১০টি ও মল্লিনাথ ১২১টি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে মেঘদূত সম্পাদনার সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন— ''মেঘদূতে শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকে ১১৬, কলিকাতা মুদ্রিত পুস্তকে ১১৮, বারাণসী মুদ্রিত পুস্তকে ১২১, মুম্বয়ী (মুম্বাই) মুদ্রিত পুস্তকে ১২৫ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ১২৭। তন্মধ্যে ১১২টি শ্লোক সকল পুস্তকেই সন্নিবেশিত আছে।'' বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী... ''১১০টি শ্লোক কালিদাস প্রণীত; অবশিষ্ট ১৭টি তদীয় লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।''

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রিত পুস্তকে ১১৮টি শ্লোকের মধ্যে ৬৪টি পূর্বমেঘের অন্তর্গত এবং ৫৪টি উত্তরমেঘের অন্তর্গত।

''কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘনসংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।'' — কাহিনী (রবীন্দ্রনাথ)

মেঘদূত কাব্য সম্পর্কে কবিগুরু তাঁর 'মেঘদূত' কবিতায় যথার্থই বলেছেন। কর্তব্যে অবহেলায় এক যক্ষকে প্রভু কুবের অভিশাপ দিয়ে অলকাপুরী থেকে রামগিরির বিজন আশ্রমে নির্বাসিত করেন। যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে (পাঠান্তরে 'প্রশম দিবস' অর্থাৎ শেষ দিনে) রামগিরি পর্বতের চূড়া স্পর্শ করে মেঘের আবির্ভাব হতেই সেই যক্ষ কিছুক্ষণ চোখের জল আটকে ভাবনায় ডুবে গেলেন।

কশ্চিত্ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসন্তি রামগির্যাশ্রমেষু।। (পূর্বমেঘ—১)

নববর্ষার নতুন মেঘকে দেখে অলকার রম্য নিকেতনে বিরহিণী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে শুভবার্তা পাঠাতে মনস্থির করেছেন যক্ষ। বিরহদুঃখের আতিশয্যে প্রেমিক যক্ষের নিকট জড় ও চেতনের ভেদাভেদ লুপ্ত মেঘের উদ্দেশ্যে কুটজ ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করে তাই যক্ষ প্রেয়সীকে নিজের কুশলবার্তা জানানোর জন্য অলকাপুরীতে (যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'কামনার মোক্ষধাম') প্রেরণ করে।

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যজহার।। (পূর্বমেঘ—৪)

মেঘ কোন পথ দিয়ে অলকায় পৌঁছাবে তার বর্ণনা মহাকবি এই কাব্যে চিত্রায়িত করেছেন। মেঘের যাত্রাপথ

বর্ণনায় ভৌগোলিক ভারতের এক রসময় চিত্র উপস্থাপিত। মানস সরোবর, অমরুকুট পর্বত, দশার্ণ জনপদ, বিদিশা নগরী, আম্রকূটলেশ, রেবানদী, চলোর্মি, বেত্রবতী, চর্মন্বতী-শিপ্রা-দৃশদ্বতী-নির্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু নদী, ব্রহ্মাবর্ত-কুরুক্ষেত্র-দশপুর প্রভৃতির বর্ণনা করা হয়েছে।

'তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাত্
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি।।' (পূর্ব মেঘ—২৫)

মানস সরোবর থেকে জল গ্রহণ করে এবং তাম্রকূট পর্বতে বিশ্রামলাভ করে মেঘ বিদিশানগরীতে পৌঁছাবে— তার বর্ণনা উক্তশ্লোকের মধ্যে ফুটে ওঠে। আবার যদি মেঘ জলশূন্য হয়ে যায় তবে সে যেন নিবিন্ধ্যা নদীতে নেমে জলগ্রহণ করে। কেননা পরিপূর্ণতাই শ্রী সম্পাদন করে— এরূপ কথাও যক্ষ মেঘের উদ্দেশ্যে বলেছেন। এরপর মেঘ পৌঁছাবে উজ্জয়িনীতে। (তা বোঝা যায় পূর্বমেঘ ৩১নং শ্লোক থেকে।)

এর পরেই বিদিশানগরীর বর্ণনা মহাকবি চিত্রায়িত করেছেন। এই নগরীতে গগনস্পর্শী অট্টালিকায় লাবণ্যবতী ললনারা বিরাজিতা, সেখানে প্রণয়কলহ ভিন্ন কলহ নেই, যৌবন ভিন্ন বয়স নেই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু নেই।

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাত্।
ন্যাপ্যন্যস্মাত্ প্রণয়কলহাদ্ বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।। (উত্তরমেঘ—৪)

এমন মনোরম পরিবেশে যক্ষের বাসগৃহ। অলকাপুরীর সুন্দরীরা আদি সৃষ্টি তিলোত্তমার ন্যায় অপরূপ সুন্দরী। তারপরে দেখা যায় বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়াকে। যেন শিশিরমথিতা মৃণালিনী, প্রাচীনমূলে শীর্ণ চন্দ্রকণা; মলিনবসনা এক বীণাবাদিনী। বিরহিনীর অঙ্কে বীণার তারগুলি চোখের জলে ভেজা। বিনিদ্র রজনী যাপনের ফলে চোখ ফোলা।

অবশেষে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করেছে পত্নীর কাছে কুশল সংবাদ নিবেদন করতে। যক্ষ তাকে এক কথায় বলে যে; এই প্রার্থনা অনুচিত তবুও তার প্রতি সৌহার্দ্যের কারণেই হোক কিংবা তার বিরহকাতরতায় দয়াবশতই হোক, মেঘ যেন এই সংবাদবহনের প্রীতিকর কাজটি করে দেয়। আর যক্ষের মত যেন মেঘ কখনো তার প্রিয়া অর্থাৎ বিদ্যুতের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

এতত্কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ! বিচরপ্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা: বিপ্রয়োগা।। (উত্তরমেঘ—৫৪)

সমালোচনা

মেঘদূত কালিদাসের অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। মেঘকে দূত করে অলকায় যক্ষপ্রিয়ার কাছে প্রেরণের কল্পনা কালিদাসের মৌলিক কল্পনা নয়। হনূমানকে দূত করে রামচন্দ্র অভিজ্ঞান সহ স্বীয় কুশলবার্তা যে সীতার কাছে

পাঠিয়েছিলেন, রামায়ণের এই ঘটনা কালিদাসের মেঘদূত রচনার প্রেরণা দিয়ে থাকবে। মল্লিনাথ অবশ্য এরকমই অভিমত পোষণ করেছেন।

মেঘদূত বা মেঘসন্দেশ নামে এই কাব্যটি কারও কারও কাছে কেলিকাব্য, ক্রীড়াকাব্য বা খণ্ডকাব্য। কেউ কেউ আবার এটিকে বর্ষাকাব্য, বিরহ কাব্য, গীতিকাব্য এমনকি মহাকাব্য বলেও চিহ্নিত করে থাকেন। তবে আত্মমগ্ন ভাবোচ্ছ্বাসের মাপকাঠিতে মেঘদূতকে গীতিকাব্যরূপে চিহ্নিত করলেও মেঘের যাত্রাপথ কিংবা অলকাপুরীর বর্ণনায় অথবা বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার বীণাচিত্র নির্মাণে মহাকাব্যের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরপ্রিয়তার আভাসও এতে বর্তমান। তবে একথা ঠিক যে অপূর্ণ কামনাবাসনার ব্যাকুলতা, বিরহী হৃদয়ের আর্তি, গীতিপ্রবণতা মেঘদূত কাব্যটিকে যে অসাধারণ মাধুর্যের মহিমায় মণ্ডিত করেছে, তা এককথায় অতুলনীয়।

'মেঘদূত' পরবর্তীকালে বহু দূতকাব্যের উৎস হয়। একে অনুসরণ করে ধোয়ী 'পবনদূত' রচনা করেন। এছাড়া বেদান্তদেশিকের 'হংসসন্দেশ', ব্রজনাথের 'মনোদূত', কৃষ্ণানন্দের 'দেবদূত' উল্লেখযোগ্য।

ছন্দঃ পরিচিতি

'মেঘদূত' কাব্যটি সম্পূর্ণ মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়েছে। এই ছন্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য গঙ্গাদাস কবিরাজ তাঁর ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন—**'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মম্।'** এই ছন্দে 'মভন তত গগ' গণ থাকে। এই ছন্দের প্রতিটি চরণে সপ্তদশ অক্ষর থাকে এবং প্রথমে চতুর্থ অক্ষরের পর তারপরে ষষ্ঠ অক্ষরের পর অর্থাৎ দশম অক্ষরের পর এবং তার পরবর্তী সপ্তম অর্থাৎ সপ্তদশতম অক্ষরের পরে যতি চিহ্ন সূচিত হয়। লক্ষণ বাক্যে 'অম্বুধি' (সাগর) কথার দ্বারা চার, 'রস' কথার দ্বারা ছয় এবং 'নগ' কথার দ্বারা সাত সংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের মূল্যায়ন

''কবিতা নিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?''

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কালিদাস' কবিতায় মহাকবির সম্বন্ধে একথা বলেছেন। দৃষ্ট বা কল্পিত, স্থূল বা সূক্ষ্ম, বাহ্য বা অন্তঃ সব বিষয়ের নিপুণ বর্ণনায় অপ্রতিহত ক্ষমতা কালিদাসের সহজাত। সুদক্ষ ঘটনা বিন্যাস, মধুর সংলাপ এবং সজীব চরিত্রগুলি রচনার প্রধান আকর্ষণ। অনবদ্য ভাষা ও যথোপযুক্ত অলংকার প্রয়োগের দ্বারা তাঁর কাব্য হয়েছে অত্যন্ত মনোগ্রাহী। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চৈতালি কাব্যে মহাকবির সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন—

''জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান—
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছে দান।।''

গল্পপ্রিয় ভারতীয়

—অর্চিতা বণিক

গল্প শোনার আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। গল্প বলার ভঙ্গী সে আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। একই কাহিনী নানা যুগে নানা ভাবে বলা হয়েছে। তবুও মানুষের কাছে তা কখনো পুরোনো হয়নি। উর্বশী পুরূরবার কাহিনী ঋগ্‌বেদে শুনেছি, পুরাণে শুনেছি, মহাভারতে শুনেছি এমনকি কালিদাসের নাটকেও শুনেছি। কাহিনী এক হলেও বর্ণনার সব নব নব ভঙ্গীর জন্য সেটি নিত্য নতুন ও উপাদেয় লাগে। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাণ-সুবন্ধু-দণ্ডীও গল্পই বলেছেন। সেই বলার ভঙ্গীটি অবশ্যই ভাল লেগেছিল। কিন্তু এই ভঙ্গীর প্রতি আকর্ষণ চিরদিন থাকে না, তাই চম্পূকাব্যে সেই ভঙ্গী নতুন রূপ গ্রহণ করল। সে ভঙ্গীও পুরোনো হল, আর তখন এল গল্পসাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শাখারূপে কথাসাহিত্যের বা গল্পসাহিত্যের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই সংস্কৃত কথাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হল গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দান।

গল্পসাহিত্যের উদ্ভবের মূলে রয়েছে তিনটি কারণ—১. অবসরযাপন; ২. চিত্তবিনোদন; ৩. নীতি-শিক্ষা দান। এককালে কোমলমতি রাজকুমারদের অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন করার জন্যই রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পশুপাখি, মানুষ, গন্ধর্ব, দৈত্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। শিশুশিক্ষার বাহনরূপে গল্পকে নির্বাচন করার কৃতিত্ব ব্রাহ্মণদেরই। গল্পসাহিত্যের সাথে তাই অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

গল্পের চরিত্ররূপে পশুপাখিকে নির্বাচিত করে শিশু-শিক্ষার পুরোধাগণ শিশুগণকে একসময়ে জীবন ও প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সাথে পরিচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। গল্প সাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগুলির তাই দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগ আছে—

ক. একভাগের চরিত্রগুলি মানুষ; খ. একদিকের চরিত্র পশুপাখি। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পগুলিকে একটু স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য ইংরেজীতে বলা হয় Fable এবং Fairy tales. তাই এই জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Macdonell বলেছেন— 'In these fables and fairy tales, the abundant introduction of ethical reflection and Popular Philosophy is Characteristic, the apaloque with its moral is peculiarly subject to this method of treatment.'

পঞ্চতন্ত্র

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মহত্ত্বমণ্ডিত গল্পগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। বাইবেলের পর পৃথিবীতে এত বহুল প্রচারিত গ্রন্থ আর নেই। প্রায় ৫০টি ভাষায় দুই শতকেরও অধিক সংস্করণে পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল সম্পর্কে Hertel বিশদ আলোচনা করেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পরে যে গ্রন্থটি রচিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিষ্ণুশর্মা নামক এক পণ্ডিত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির বিবেকহীন তিন পুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন। মূলগ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত— ১. মিত্রভেদ, ২. মিত্রপ্রাপ্তি, ৩. কালোলূকীয়, ৪. লব্ধপ্রণাশ, ৫. অপরীক্ষিত কারক।

গ্রন্থারম্ভে লেখক নিজেই বলেছেন—

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।

তন্ত্রৈঃ পञ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্।। (কথামুখ ३)

মূলগ্রন্থে মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে অনেকগুলি ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ এই গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত প্রতিটি গল্পের শেষে নীতিবাক্য অভিব্যক্ত হয়েছে হৃদয়গ্রাহী শ্লোকে। অমরশক্তি ও বিষ্ণুশর্মা নামের ঐতিহাসিকত্ব আজও নির্ণীত হয়নি। মহিলারোপ্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত, সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, দাক্ষিণাত্যই পঞ্চতন্ত্রের রচনাস্থান।

বিশ্বসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব

কাশ্মীরী পঞ্চতন্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রাখ্যায়িকা থেকে পহ্লবী (প্রাচীন ফার্‌সী) ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল (৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে)। উক্ত ফার্‌সী অনুবাদ লুপ্ত হলেও তদবলম্বনে রচিত আরবী ও সীরীয় সংস্করণ থেকে প্রাচীন পহ্লবী গ্রন্থের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। এই সীরীয় ও আরবী সংস্করণ থেকে ইউরোপীয় গল্পসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল। হার্টেলের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ভারতের চার প্রান্তে এবং বহির্ভারতে জাভা থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত ৫০টির অধিক ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের দু'শোরও বেশী রূপান্তর সম্পাদিত হয় এবং তার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই অভারতীয় ভাষায় লিখিত। খশ্‌রু অনুশীরবান্ (৫৩১-৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)-এর তত্ত্বাবধানে বার্জো নামক এক আরবী হাকিম (৫৫০ খ্রীস্টাব্দ) পঞ্চতন্ত্রের পহ্লবী অনুবাদ করেন যার নাম 'করটক-দমনক'। তারপর বুদ নামে জনৈক ফার্‌সী খ্রীষ্টান উক্ত পহ্লবী অনুবাদ থেকে প্রাচীন সীরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন (৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং নামকরণ করেন 'কলিলগ্ উঅ দম্‌নগ্'। এই অনুবাদের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় না। সীরীয় সংস্করণ থেকে Abdallah ibn-al-Moqaffa কর্তৃক (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে) 'কলিল্‌হ্ উফ দিম্‌নহ্' নামে আরবীতে অনূদিত হয়। তারপর ইউরোপের বহু ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়েছিল। ১০ম - ১১শ শতকে সীরীয় ভাষায়, ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকে, ১১শ শতকে Rabbi Joel কর্তৃক আরবী থেকে হিব্রুতে, ১২৫১ খ্রীঃ স্পেনীয় ভাষায়, ১২৬৩ - ৭৮ খ্রীঃ ল্যাটিনে এবং ১৪৮০ খ্রীঃ ল্যাটিনে দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৮৩ খ্রীঃ Anthonius Von Pforr কর্তৃক Das buch der byspel der alten wysen (অর্থাৎ The book of gospel of old sages) নামে জার্মানে, ১৫৫২ খ্রীঃ A. F. Doni কর্তৃক দু'খণ্ডে ল্যাটিন অনুবাদ এবং উক্ত ল্যাটিন অনুবাদ থেকে Thomas Narth প্রথম খণ্ডের ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং নাম দেন The morale philesaphie of Doni, Jiulio Nuti' গ্রীক থেকে ইতালিতে অনুবাদ করেন ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ডাচ, হাঙ্গেরীয়, মালয়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়।

হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির আদর্শে রচিত হিতোপদেশ আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রচয়িতা নারায়ণশর্মা রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। এই গ্রন্থের ৪৩টি কথার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র থেকে ২৫টি গল্প নেওয়া হয়েছে। অন্যস্থল থেকে ১৪টি গল্প গৃহীত। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এই ঋণ স্বীকার করে গ্রন্থকার বলেছেন—

पञ्चतन्त्रात्तथान्यस्माद् ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते।

পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এটি রচিত হয়। এর চারটি অধ্যায়—

১. মিত্রলাভ ২. সুহৃদ্‌ভেদ ৩. বিগ্রহ ৪. সন্ধি ।

এই গ্রন্থের গঠনে ও আঙ্গিকে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব থাকলেও গ্রন্থকারের ঘটনাবিন্যাস কৌশল অবশ্যই প্রশংসনীয়। ভাষার খুবই সরলতর ও সহজ আবেদন লক্ষণীয়। কথাচ্ছলে বালকদের নীতি উপদেশদানই গ্রন্থকারের লক্ষ্য।

বৃহত্‌কথা

গুণাঢ্য বিরচিত 'বৃহত্‌কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হলেও আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। একলক্ষ শ্লোকে এবং পৈশাচী প্রাকৃতে মূল বৃহত্‌কথা রচিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে বৃহত্‌কথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে—

১. মূল কাহিনী নারায়ণ দত্তকে কেন্দ্র করে এটি রচিত।

২. তন্ত্রশাস্ত্রের মতো এই কাহিনীও শিব-পার্বতীর কথোপকথনের আকারে বিবৃত।

৩. গল্পটি খুবই চিত্তকর্ষক।

৪. কামকথা অর্থাৎ প্রণয় ও শৃঙ্গার প্রধান কাহিনীর বাহুল্য।

৫. পরিচ্ছেদগুলি 'লম্ভ' নামে খ্যাত।

সংস্কৃত সাহিত্যে বৃহত্‌কথার প্রভাব অপরিসীম। এই গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে অসংখ্য কাব্য নাটক হয়েছে। যেমন— দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' প্রভৃতি।

কথাসরিৎসাগর

পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'বৃহত্‌কথার' সংস্কৃত সারসংক্ষেপ হল— কথাসরিত্‌সাগর। এর রচয়িতা সোমদেব কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ বামনভট্টের পুত্র। সোমদেব কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাকবি ছিলেন। রাজত্বকালের শেষদিকে রাজমহিষী সূর্যমতীর চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই গল্পটি রচিত হয়। ১৮টি লম্বকে ও ১২৪টি তরঙ্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ২২০০টি শ্লোক আছে। বিভিন্ন গল্পের স্রোতধারা এসে এই গ্রন্থে যেন সমুদ্রের আকার ধারণ করেছে। উদয়ন - বাসবদত্তা,

নরবাহনদত্ত - মদনমঞ্জুকা প্রভৃতির কাহিনী এই গ্রন্থের অন্যতম বর্ণনীয় বিষয়। বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধজাতকের অনেক কাহিনীও কথাসরিত্সাগরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটি থেকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়।

সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমচরিত

বত্রিশটি গল্পের সংকলন 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' বা 'বিক্রমচরিত' একটি জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থ। মূলগ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর প্রসিদ্ধ রাজসিংহাসনটি কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। পরে ধরাধিপতি ভোজ সেই সিংহাসনটি উদ্ধার করেন। ভোজরাজ সেই সিংহাসনে আরোহণের উপক্রম করলে সিংহাসনগাত্রে খোদিত ৩২টি পুত্তলিকা জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণসম্পন্ন না হলে এই সিংহাসনে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না— এই মূলতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই গল্পগুলির অবতারণা করে তারা। বিষয়বৈচিত্র্যের অভাবে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা সীমিত।

শুকসপ্ততিকথা

৭০টি গল্পের সংকলনরূপে চিন্তামণি ভট্ট বিরচিত 'শুকসপ্ততিকথা' গল্প সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি দ্বাদশ শতকের পরবর্তী রচনা ও সম্ভবতঃ কোনো প্রাচীন সংস্করণের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত।

বেতালপঞ্চবিংশতি

২৫টি গল্পের সংকলন বেতালপঞ্চবিংশতি গল্পসাহিত্যের আর একটি অমূল্য সম্পদ। রচয়িতা হলেন শিবদাস। গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময়। গল্পের ধাঁধাগুলি বুদ্ধিদীপ্ত। হাস্যরস পরিবেশনেও লেখকের নৈপুণ্য স্পষ্ট। এই গল্পগুলিতে লোকসাহিত্যের ছাপ বর্তমান। গ্রন্থটি গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত।

উল্লিখিত রচনাসমূহ ছাড়াও জৈনাচার্য রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ', মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধচিন্তামণি' এবং বৌদ্ধজাতকের গল্পগুলি সংস্কৃত তথা পালি - প্রাকৃত ভাষার গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে রসসিদ্ধান্ত

শ্রেয়া সরকার

অপূর্বং যদ্বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাঁ
জগদ্ভাবপ্রখ্য নিজরসভরাত্সারয়তি চ।
ক্রমাত্প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তত্
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে।।

লোচনটীকা–ধ্বন্যালোক: প্রথম উদ্যোত:

অপূর্ব যে বস্তু কোন প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই সৃষ্ট হয় এবং বিস্তারলাভ করে, পাষাণতুল্য নিষ্প্রাণ এই জগৎকে নিজের রসের মাধুর্যে সারযুক্ত করে, যথাক্রমে প্রতিভা ও বর্ণনার চাতুর্যে সাধারণ বিষয়কেও হৃদ্য করে প্রকাশিত করে, সরস্বতীর সেই কাব্যনামক তত্ত্ব যেখানে কবি এবং সহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ, তা জয়যুক্ত হয়।

পৃথিবীর স্থলভূমি, জলভূমি জীবজগৎ সব কিছুরই ভিন্ন সৌন্দর্য আছে। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য ঈশ্বরের সৃষ্টি। কবিপ্রতিভায় এই সৌন্দর্য আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়। কবির লেখনীর মাধ্যমে মানবচিত্তের সুখ, দুঃখ, শোক, প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয়। কাব্য সৌন্দর্য বিষয়ক কিছু বিষয়ের মধ্যে মূল বিষয় হিসাবে এই প্রবন্ধে ‘রস’-কে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

প্রথমেই এই প্রবন্ধের বিষয় কাব্য সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য ও আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী কাব্য সৌন্দর্য বিষয়ক ছয়টি প্রস্থান ও তার আচার্যগণের সামান্য পরিচয় দান প্রয়োজন। পরবর্তীতে রসপ্রস্থান ও রস সম্বন্ধে কিছু তথ্য, রসসম্বন্ধীয় বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবের পরিচয়, তার পরবর্তী স্থায়িভাব ও রস এবং সর্বশেষে রসতত্ত্বপ্রতিপাদক আচার্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সর্বশেষে ভরতমুনির রসসূত্রকে কেন্দ্র করে অন্যান্য আলঙ্কারিকদের মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এখানে।

ভূমিকা ঃ

কাব্য ‘কবে: কর্ম’ (কবির কাজ) - এই বিগ্রহে ‘কবি’ শব্দের উত্তর কর্ম অর্থে ‘ষ্যঞ্’ প্রত্যয় করে কাব্য শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, কাব্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল কবির কাজ। এখানে ‘ষ্যঞ্’ প্রত্যয়বিধানের সূত্র হল—

‘গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্য: কর্মণি চ’ Pa 5.1.124।

আবার, কাব্য শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল—‘গুণ ও অলঙ্কারবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ। বামন বলেছেন—

‘কাব্যশব্দোঽয়ং গুণালঙ্কারসংস্কৃতয়ো: শব্দার্থয়োর্বর্ততে। কাব্যালঙ্কারসুত্রবৃত্তি:, প্রথমাধিকরণম্।

কাব্যের শরীর বিষয়ে দুটি অভিমত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ কেবল শব্দকে আবার কেউ শব্দ ও অর্থ উভয়কে কাব্যের শরীর বলে থাকেন। যেসব আচার্যগণ কেবল শব্দকেই কাব্যের শরীর বলেছেন তাঁরা হলেন— আচার্য দণ্ডী,

জগন্নাথ, বিশ্বনাথ ভোজ, জয়দেব, প্রমুখ। 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে দণ্ডী বলেছেন— 'শরীরং তাবদ্ ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী', (১/১০), 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে জগন্নাথ বলেছেন— 'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক: শব্দ: কাব্যম্' (১/১)। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথকবিরাজের অভিমতানুযায়ী—'বাক্যম্ রসাত্মকম্' কাব্যম্। এছাড়া জয়দেবের 'চন্দ্রালোক', ভোজের 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' (১ম পরিচ্ছেদ) গ্রন্থে কাব্যের শরীররূপে শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে। আচার্য ভামহ, কুন্তকের মতে শব্দ ও অর্থ উভয়েই হল কাব্যের শরীর। 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে ভামহের উক্তি— 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' (১/১৬)। কুন্তকের মতানুযায়ী—'শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি' (১/৭)।

কাব্যের কেবল শরীর থাকলেই সেই কাব্য সহৃদয় মনে রসানুভূতি ঘটাতে পারে না। সুতরাং, কাব্যের এমন কোন ধর্ম আছে যা কাব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। অর্থাৎ কাব্যের যেমন শরীর আছে তেমনি আছে আত্মা। কাব্যের আত্মা প্রসঙ্গে আলোচনায় আচার্য বামন সর্বপ্রথম রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। তিনি তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন— 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (১/৬)। এই রীতি হল তিনপ্রকার— বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী।

কাব্যের স্বরূপকে কেন্দ্র করে আলঙ্কারিকদের মধ্যে যেমন বৈমত্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি কোন বিশেষ উপাদান কাব্যকে সুষমামণ্ডিত করে এই বিষয়েও তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ রীতিকে, কেউ রসকে, কেউ বা অলঙ্কারকে, কেউ বক্রোক্তিকে আবার কেউ ধ্বনিকে কাব্যের আত্মভূত বলেছেন। এই বিভিন্ন মতকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত কাব্য-সমীক্ষাশাস্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা প্রস্থানের উদ্ভব হয়।

অলঙ্কারশাস্ত্রে স্বীকৃত প্রধান ছয়টি প্রস্থান হল—

১. অলঙ্কারপ্রস্থান ২. রীতিপ্রস্থান

৩. রসপ্রস্থান ৪. ধ্বনিপ্রস্থান

৫. বক্রোক্তিপ্রস্থান ৬. ঔচিত্যপ্রস্থান

এছাড়াও আরও দুই প্রকার মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১. গুণপ্রস্থান ২. অনুমানপ্রস্থান - মহিমভট্ট (ব্যক্তিবিবেক)

১. **অলঙ্কারপ্রস্থান ঃ** কাব্যে যাঁরা অলঙ্কারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের নিয়েই গড়ে উঠেছে অলঙ্কারপ্রস্থান। অলঙ্কারপ্রস্থানের প্রধান প্রবক্তা আচার্য ভামহ তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে অলঙ্কারের বিশদ বর্ণনা করেছেন। এই প্রস্থানের দ্বিতীয় আচার্য উদ্ভট। তাঁর গ্রন্থ 'অলঙ্কারসারসংগ্রহ'। এই গ্রন্থের টীকার নাম লঘুবৃত্তি। এছাড়াও আরও দুটি গ্রন্থ হল রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কার' এবং আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'। অবশ্য দণ্ডী বিশেষভাবে বৈদর্ভীরীতির সমর্থক হওয়ায়, তাঁকে অলঙ্কারসম্মত রীতিবাদী বলা অধিক সঙ্গত।

২. **রীতিপ্রস্থান ঃ** রীতিবাদী আলঙ্কারিকরা কাব্যে রীতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। রীতিপ্রস্থানের আলঙ্কারিকদের মধ্যে দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থে রীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. **রসপ্রস্থান ঃ** কাব্যে যাঁরা রসের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য স্বীকার করেন, কাব্যশাস্ত্রসমীক্ষার ইতিহাসে তাঁরাই 'রসপ্রস্থানিক' নামে পরিচিত। ভরত-প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে রসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নবম শতাব্দীর আনন্দবর্ধন এই রসতত্ত্বকে বিশেষ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' ও জগন্নাথ রচিত 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে রসের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থেও ভক্তিরসের স্ফুরণে রসতত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

৪. **ধ্বনিপ্রস্থান ঃ** আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রস্থানের আলঙ্কারিকদের মত খণ্ডন করে, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ধ্বন্যালোক'-এর ওপর রচিত অভিনবগুপ্তের 'লোচন' টীকায় ধ্বন্যালোকের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৫. **বক্রোক্তিপ্রস্থান ঃ** সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে বক্রোক্তিপ্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতারূপে আচার্য কুন্তক বিশেষ পরিচিত। তাঁর রচিত 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থে 'বক্রোক্তি' শব্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় ভামহের কাব্যালঙ্কারে। ভামহের মতে, শব্দ ও অর্থের 'বক্রতা' অর্থাত্ চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগের দ্বারা অলঙ্কার সৃষ্টি হয়।

৬. **ঔচিত্যপ্রস্থান ঃ** ধ্বনিবাদের বিরুদ্ধ প্রস্থানগুলির মধ্যে ঔচিত্যপ্রস্থান অন্যতম। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র এই প্রস্থানের প্রতিষ্ঠাতা। 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' নামক গ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যকে কাব্যের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন।

২। রসপ্রস্থান ও রস ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যে 'অলঙ্কার' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রচলিত। সাধারণ অর্থে অলঙ্কার বলতে বোঝায় কাব্যের শোভাসম্পাদক উপকরণ বিশেষ। কাব্যতত্ত্ববিদ্‌রা 'আলঙ্কারিক' নামে পরিচিত। কোন কোন আলঙ্কারিকদের মতে রস হল কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক উপাদান। রসই কাব্যের আত্মা। ভরতমুনি ছিলেন রসপ্রস্থানের পথিকৃৎ। 'রস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'অলৌকিক আনন্দ'। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলছেন— 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'-অর্থাৎ রসরূপ আত্মাবিশিষ্ট বাক্যই হল কাব্য। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्ति:'। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী— এই তিন ভাবের সংযোগে রস নিষ্পন্ন হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রসসূত্রের ব্যাখ্যা করছেন—

'विभावेनानुभावेन व्यक्त: सञ्चारिणा तथा।

रसतामेति रत्यादि: स्थायी भाव: सचेतसाम्।।' সা.দ. ৩/১

অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাব (ব্যভিচারী ভাব)-এর দ্বারা প্রকাশিত রতি প্রভৃতি হল স্থায়িভাব। সহৃদয়ের আস্বাদনপ্রকার সম্বন্ধে বলেছেন—

'सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय:।

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर:।।

लोकोत्तरचमत्कारप्राण: कैश्चित् प्रमातृभि:।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस:।। সা. দ. ৩/২

অর্থাৎ, প্রমাতৃগণ (জ্ঞানীব্যক্তিদের) সত্ত্ব (মনোবৃত্তির) উদ্রেকের ফলে অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়াত্মক, আনন্দস্বরূপ, অন্য জ্ঞেয় পদার্থের স্পর্শ শূন্য, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তুলনীয়, লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ যার, এমন রসের আস্বাদন করেন।

৩. বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব ঃ

ক) **বিভাব ঃ** রসচর্বণার আন্তর উপাদান স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব, এদের বাহ্য উপাদন বিভাব ও অনুভাব। বিভাব রসানুভূতির কারণ। পৃথিবীতে রতি, শোক প্রভৃতি স্থায়িভাবের যারা কারণ, তারা যখন কাব্যে ও নাট্যে প্রবেশ করে তখন লৌকিককারণ সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে অলৌকিক 'বিভাব' আখ্যা লাভ করে। বিশ্বনাথকবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে বিভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'रत्याद्युद्बोधका लोके विभावा: काव्यनाट्ययो:'

অর্থাৎ কাব্য এবং নাটকে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের উদ্‌বোধককে বিভাব বলে। লক্ষ্মীটীকায় বিভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'वासनारूपतया अतिसूक्ष्मरूपेणावस्थितान् रत्यादीन्।

स्थायिन: विभावयन्ति आस्वादयोग्यतां न... विभावा:।।' —অতি সূক্ষ্ম বাসনারূপে অবস্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে যা আস্বাদের যোগ্য করে তোলে, তাকে বিভাব বলে।

আলম্বন ও উদ্দীপনভেদে বিভাব (দ্বিবিধ)। নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি যেসমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে রসাত্মক চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাই হল আলম্বন বিভাব। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে—

'आलम्बनं नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्' ।। ৩৫।।

যে বিভাব রসকে উদ্দীপিত করে অর্থাৎ প্রকাশিত করে সেই বিভাবকে উদ্দীপন বিভাব বলে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ উদ্দীপন বিভাব প্রসঙ্গে বলেছেন—

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये।। ১৩৪।।

আলম্বনস্য চেষ্টাদ্যা দেশকালাদয়স্তথা।। ১৩৫।।

আলম্বন বিভাব অর্থাৎ নায়ক নায়িকা প্রভৃতির অঙ্গচালনা এবং দেশকাল প্রভৃতি হল উদ্দীপন বিভাব।

খ) **অনুভাব ঃ** লৌকিক চিত্তবৃত্তির উৎপত্তির পর যা উৎপন্ন হয় তা অনুভাব নামে পরিচিত। আলঙ্কারিকরা বলেছেন — আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুমাপক কার্যসমূহ যখন কাব্যে ও নাট্যে প্রবেশ লাভ করে এবং লৌকিক কাব্যপ্রতিভার স্পর্শে লোকোত্তর হয়ে ওঠে, তখন তারা 'অনুভাব' আখ্যা লাভ করে। সাহিত্যদর্পণে অনুভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

উদ্বুদ্ধং কারণৈ: স্বৈ: স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।

লোকে য: কার্যরূপ: সোঽনুভাব: কাব্যনাট্যয়ো:।। ১৩৬।।

নিজের নিজের কারণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যে ভাবগুলি (নায়ক, নায়িকা প্রভৃতিতে) বাহ্যভাবে অভিব্যক্ত হয়, কার্যরূপ সেই ভাবগুলিকে অনুভাব বলা হয়।

অনুভাবের তালিকা—

স্তম্ভ: স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ: স্বরভঙ্গোঽথ বেপথু:।

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা: স্মৃতা:।। ১৩৯।।

অর্থাৎ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় এই ৮টি সাত্ত্বিক অনুভাব লক্ষিত হয়।

গ) **ব্যভিচারিভাব ঃ** রসের আস্বাদনে সহায়করূপে বিদ্যমান বিভাব, অনুভাব থেকে ভিন্ন যে ভাবগুলি স্থায়িভাবের উপস্থিতিতে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, সেগুলিকে ব্যভিচারিভাব বলে। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে ব্যভিচারিভাবের লক্ষণ করেছেন—

'বিশোষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণ:।

স্থায়িন্যুন্মগ্ননিমগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্‌ভিদা:।।' ১৪১॥

ব্যভিচারিভাবের সংখ্যা ৩৩টি।

নির্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধ:

স্বপ্নাপস্মারগর্বা মরণমলসতামর্ষনিদ্রাবহিত্থা:।

ঔৎসুক্যোন্মাদশঙ্কা স্মৃতিমতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা

হর্ষাসূয়াবিষাদা: সধৃতিচপলতা গ্লানিচিন্তাবিতর্কা:।। ১৪২।।

রূপক বা দৃশ্যকাব্যে নায়ক নায়িকা ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হল বিভাব। তাদের অভিনয় হল অনুভাব এবং তাদের মধ্যে যে ভাবগুলি (নির্বেদ, আবেগ, শ্রম) হঠাৎ করে উদ্ভূত হয়ে পরক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়, তা হল ব্যভিচারিভাব।

এই ভাবগুলি আমাদের মনে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে জাগিয়ে তোলে এবং তা যখন আস্বাদিত হয়, তখনই রসানুভূতি হয়।

৪. স্থায়িভাব এবং রস ঃ

বিশ্বনাথকবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে স্থায়িভাব সম্বন্ধে বলেছেন—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমা:।

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাব: স্যায়ীতি সংমত:।। ১৭৩।।

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা যে ভাবগুলি তিরোহিত হয় না, যে ভাবগুলি রসাস্বাদের বীজ বা অঙ্কুরস্বরূপ সেগুলি হল স্থায়িভাব। স্থায়িভাব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন —রতি, হাস্য, করুণ, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম এই নয়টি স্থায়িভাব আছে। স্থায়িভাবের শ্লোকটি হল—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তা: শমোঽপি চ।। ১৭৭।।

বিশ্বনাথের মতে রসের সংখ্যা নয়টি। সাহিত্যদর্পণে রস বিষয়ে প্রতিপাদ্য শ্লোক হল—

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকা:।

বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসা: শান্তস্তথা মত:।।

এই ৯টি রস হল শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ৪টি রসের কথা বলেন। অনেক কবিগণের মতে 'করুণ' রস হল শ্রেষ্ঠ।

রসতত্ত্ব প্রতিপাদক আচার্যসমূহ

রস-সরস্বতীর মন্দিরে স্বর্ণ-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন ভরতমুনি। ভরতের 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি:'—এই রসসূত্রটি পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। ভরতের এই সূত্রটি রসালোচনার সৌধের মূল ভিত্তি। ভরতসূত্রের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন ভট্টলোল্লট। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। লোল্লট সম্মত রসবাদকে সমালোচনা করে শঙ্কুক তাঁর ভাষ্যে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্কুক 'ভুবনাভ্যুদয়' কাব্যেরও রচয়িতা। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। ভট্টনায়কের সময় খ্রীঃ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ। ভট্টনায়কের পর রসতত্ত্বের ওপর এক নতুন আলোকপাত করেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্তের প্রতিভা বিকাশের কাল ৯৮০ খ্রীঃ — ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত যে পথ প্রদর্শন করেন তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। এনাদের মধ্যে কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ ও রসগঙ্গাধরকার জগন্নাথের নাম

উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথের গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাঁর রচনাকালে অভিনবগুপ্তের মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নব্য সমালোচকবৃন্দের সমালোচনার বহ্নি থেকে তা নিষ্কৃতি পায়নি। রসগঙ্গাধরকার জগন্নাথ নব্য মতবাদ বলে একটি নতুন মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অবশ্য উক্ত নব্য আলঙ্কারিকদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

৫. আলঙ্কারিকদের চারটি মতবাদ

নাটকের ক্ষেত্রে ভরতমুনির 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पन्ति:'—এই উক্তি রসসূত্ররূপে পরবর্তী আলঙ্কারিকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ সূত্রগত 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট। ভরতের এই উক্তিকে কেন্দ্র করে ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভক্তিবাদ, অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ প্রসারতা লাভ করে।

(ক) ভট্টলোল্লট ও তাঁর উৎপত্তিবাদ

অভিনবগুপ্ত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' টীকায় একাধিকবার যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে সেই ভট্টলোল্লট ভরতের রসসূত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তা 'উৎপত্তিবাদ' নামে অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপরিচিত। নাম থেকে অনুমান করা হয়, লোল্লট কাশ্মীর দেশের আলঙ্কারিক। পি. ভি. কানে ৮০০-৮৪০ শতক তাঁর আবির্ভাবকাল নির্দেশ করেছেন। মাণিক্যচন্দ্রসূরির মতে, রস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ভট্টলোল্লটের 'রসবিবরণ' থেকেই জানা যায়। ভট্টলোল্লটের মতে, রস সহৃদয়ের চিত্তে উদিত হয় না, কবির চিত্তেও নয়। অভিনয়ের মাধ্যমে যারা রাম-সীতা-দুষ্যন্ত-শকুন্তলার অনুকরণ করে সেইসব অনুকর্তা (অনুকরণকারী) নটনটীর চিত্তেও রসোদ্রেক হয় না। কিন্তু (অনুকার্য) অনুকরণীয় রাম, দুষ্যন্ত, যুধিষ্ঠির, সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী প্রভৃতি কাব্যে, নাট্যে বর্ণিত মূল নায়ক, নায়িকা প্রভৃতি চরিত্রেরই রস উৎপন্ন হয়। ভরতের সূত্রগত 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ উৎপত্তি। 'উৎপত্তি' পদের অর্থ আবার অভূতপ্রাদুর্ভাব, অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল না তার উদ্ভব। যে রস দুষ্যন্ত প্রভৃতি নায়ক চরিত্রে ছিল না সেই (অভূত) অবিদ্যমান রসই বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। দুষ্যন্ত প্রভৃতির রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সঙ্গে চিন্তা, গ্লানি, দৈন্য, উদ্বেগ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের পোষ্যপোষক সম্বন্ধ।

নানা বিরুদ্ধ সমালোচনায় লোল্লটের উৎপত্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। বিভাব প্রভৃতিকে রসের কারণ স্বীকার করলে তা নিমিত্ত কারণ হবে। নিমিত্তকারণ ধ্বংস হলেও কার্যধ্বংস হয় না। কিন্তু বিভাব প্রভৃতির অভাব ঘটলে রস থাকে না। তাই বিভাব প্রভৃতি রসের নিমিত্ত কারণ হতে পারেনা। আবার জ্ঞাপক কারণও হতে পারে না। কারণ জ্ঞাপক কারণের ক্ষেত্রে রসবস্তুর পূর্বে উপস্থিতি প্রয়োজন। কাজেই কোন অবস্থাতেই রস কখনও বিভাবাদি কারণের কার্য হতে পারে না।

(খ) ভট্টশঙ্কুক ও তাঁর অনুমিতিবাদ

অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-তে ভট্টশঙ্কুকের উল্লেখ করেছেন বহুবার। 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি' থেকে জানা যায় ভট্টশঙ্কুক 'সূর্যশতক' প্রণেতা ময়ূরের পুত্র। তিনি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে অবতীর্ণ হন। রাজতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে তিনি কাশ্মীররাজ অজিতাপীড়ের সমকালবর্তী এবং 'ভুবনাভ্যুদয়' গ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্কুক তাঁর ন্যায়দর্শনাশ্রিত অনুমিতিবাদে ভরতমুনি প্রোক্ত 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ করলেন অনুমিতি অর্থাৎ অনুমান। তাঁর মতে রস অনুমেয়। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব তার অনুমাপক অর্থাৎ জ্ঞাপক। ধূম যেমন পরোক্ষ বহ্নির অনুমাপক হয় এবং বহ্নি হয় অনুমাপ্য (অনুমেয়), তেমনি রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুমাপক হয় বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব। বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে রসের অনুমাপ্য-অনুমাপক সম্বন্ধ। (অনুকার্য) অনুকরণীয় রাম প্রভৃতি নায়ক চরিত্রের রসানুভূতি হয় না। রসানুভূতি হয় সামাজিকের। রসিক সহৃদয় অনুকার্য রাম, দুষ্যন্ত প্রভৃতির নয়, অনুকরণশীল (অনুকর্তা) নটেরই রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব অনুমান করেন।

ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ উৎপত্তিবাদ অপেক্ষা অনেক শ্রেয় হলেও সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। কাব্য প্রকাশের 'প্রদীপ' টীকায় বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষই চমৎকারিতা সৃষ্টি করে, অনুমান নয়। তাই অনুমিতিবাদ হৃদয়গ্রাহী হতে পারে না- 'এতদহৃদয়গ্রাহী যত: প্রত্যক্ষমেব জ্ঞানং সচমত্কারম্, নানুমিত্যাদিরিতি লোকপ্রসিদ্ধিমবধূয়ান্যথা কল্পনে মানাভাব:'। শঙ্কুকের মতের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় নট রাম, দুষ্যন্ত প্রভৃতি চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করেনি, কাজেই তাদের অনুকরণ করা নটের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ তাদের অন্তর্লীন রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুকরণ করা নটের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

(গ) **ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ**

রসসূত্রের পরিমার্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন ভট্টনায়ক। ভরতমুনির রসতত্ত্বকে ভট্টনায়ক যে পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন আলঙ্কারিক সমাজে তা 'ভুক্তিবাদ' নামে পরিচিত। ভট্টলোল্লট এবং ভট্টশঙ্কুকের তুলনায় ভট্টনায়কের মতবাদ অনেক পরিশীলিত। তিনি অভিধা, ভাবনা ও ভোগাকৃতি এই তিনটি ব্যাপারের সাহায্যে রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অভিধাবৃত্তির দ্বারা শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যের সকল অর্থ সামাজিকের পাঠক বা দর্শক বুঝতে পারে এবং তার সাহায্যে স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব সম্পর্কে সামাজিকের জ্ঞান হয়।

যে ব্যাপারের দ্বারা কাব্যবর্ণিত বিশেষত্ব বর্জন করে নায়ক-নায়িকা সাধারণ (Universal) হয়ে ওঠে, তাকে ভট্টনায়ক বলেছেন 'ভাবকত্ব' ব্যাপার বা সাধারণীকরণ। নাট্যদর্শনকালে কবি নাট্যকারের প্রতিভামণ্ডিত নাট্যবস্তু, দোষহীন গুণালঙ্কারসমৃদ্ধ বাক্যের চারুত্ব এবং নটনটীর আহার্য, সাত্ত্বিক, আঙ্গিক, বাচিক চারপ্রকার অভিনয় ও নৃত্যগীতবাদ্যের সমারোহ ঘটায় ভাবকত্ব ব্যাপার বা সাধারণীকরণের দ্বারা রস নিষ্পন্ন হয়—'তস্মাত্ কাব্যে দোষাভাবগুণালঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিডনিজমোহসঙ্কটতানিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনাভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানো রস:।'

ভট্টনায়কের মতবাদেরও কিছু ত্রুটি অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। তাঁর মতানুযায়ী শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যের রাম, দুষ্যন্ত প্রভৃতি বিভাব নিজেদের বিশেষত্ব বর্জন করে দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে ভাবনাখ্য ব্যাপারের দ্বারা সাধারণীকৃত হয়ে শাশ্বতরূপ লাভ করে ও নায়কের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব সাধারণীকৃত হয়ে পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে আশ্রয় করে। এক্ষেত্রে পাঠক বা দর্শকের নিজস্ব রতি প্রভৃতি না থাকলেও কেবলমাত্র ভাবনা ব্যাপারের দ্বারা তাদের রাম প্রভৃতির শৃঙ্গার রস অনুভূত হবে। সেক্ষেত্রে রতি প্রভৃতির বাসনাবিহীন যারা তাদেরও রসানুভূতি হবে। কিন্তু বাসনাহীন ব্যক্তির তো কখনও রসানুভূতি হয় না—

'सवासनानां सभ्यानां रसास्यास्वादनं भवेत्।

निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः।।'

সুতরাং, বাসনাযুক্ত ব্যক্তিদের রসাস্বাদন হয়। কিন্তু বাসনাহীন ব্যক্তিদের কাষ্ঠের মতো রসাস্বাদন হতে পারে না।

(ঘ) **অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ**

অভিনবগুপ্তের মতবাদ 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত। তাঁর মতে স্থায়িভাব এবং বিভাবাদির অভিব্যঙ্গ্য এবং অভিব্যঞ্জক সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়েছে। কারণ এবং কার্য একই আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে। বিভাবাদি কারণ দৃশ্যমান হবে নাটকে, রসের উদ্ভব ঘটবে সহৃদয় চিত্তে —একথা স্বীকার করলে কারণবিভাব এবং কার্যরসের আশ্রয়গত ভিন্নতা দেখা যায়। কার্যরসের সঙ্গে কারণ বিভাব প্রভৃতির একই সহৃদয়ের চিত্তে অবস্থান ঘটলে কার্য ও কারণ উভয়ের সামানাধিকরণ্য বা একাশ্রয় সম্ভবপর হতে পারে। অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ যোগাচারবাদিগণের 'यदन्तर्ज्ञेयतत्त्वं तद्बहिर्वदवभासते' এই মত আশ্রয় করে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। এই মতানুযায়ী পরিদৃশ্যমান এই বহির্বিশ্বের সবকিছুই মূলত দর্শকের আন্তর সৃষ্টি। জ্ঞাননিরপেক্ষ কোন বস্তুর বাহ্য সত্ত্বা থাকতে পারে না। নটের অনুকরণ করা রাম দুষ্যন্ত প্রভৃতির চরিত্র বা বিভাবাদি সহৃদয়ের অন্তরে বিরাজিত থেকেই ব্যঞ্জনার দ্বারা রসের অভিব্যক্তি ঘটায়।

অভিনবগুপ্তের মতে ভরতের সূত্রের 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ 'অভিব্যক্তি' বা প্রকাশ। 'সংযোগ' অভিব্যঞ্জক সম্বন্ধ বা অভিব্যঙ্গ্য। অভিনবগুপ্তের মতে মুখ্যতঃ আনন্দস্বরূপ রস, রতি, শোক, বিস্ময় প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা উপস্থিত হয়ে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' আলঙ্কারিকদের মতে শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এই মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিত্ সমালোচনা থাকলেও আলঙ্কারিক জগন্নাথ এই মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

উপসংহার

ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে সর্বপ্রথম রসনিষ্পত্তি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ভরতের এই রসসূত্র ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আলঙ্কারিক সচেষ্ট হন। রসশাস্ত্রের ক্ষেত্রে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ ও অভিব্যক্তিবাদ —এই সিদ্ধান্তচতুষ্টয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভট্টলোল্লটের মতানুযায়ী বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি। শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ মুখ্যতঃ সামাজিকের রসাস্বাদনকে গুরুত্ব দিয়েছে। এছাড়াও ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ ও অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। রসপ্রস্থানের আলঙ্কারিকদের মতে রসই কাব্যের একমাত্র মূলীভূত তত্ত্ব, অপরাপর উপাদান বাহ্য। কবিচিত্তের রসানুভূতি থেকে কাব্যের উদ্ভব, সামাজিকের চিত্তের রসানুভূতিতে কাব্যের পর্যবসান। বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে পুষ্প, পুষ্প থেকে ফল হয়। এখানে বীজই হল সবকিছুর মূল। অনুরূপে দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্যকাব্যের ক্ষেত্রেও রসই মূলীভূত তত্ত্ব, অন্যান্য ভাবসমূহ রসেই ব্যবস্থিত। নাট্যশাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

'यथा वीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं तथा।

तथा मूलं रसाः सर्वे तभ्यो भावा व्यवस्थिताः।।'

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাস

ঋষভ চক্রবর্তী

ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য অতিপ্রাচীন, যুদ্ধ, উৎসব আর প্রার্থনা বা ভজনের সময় গান বাজানোর প্রয়োগ দেখা যেত। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ৪০০০ বছর পুরানো। সঙ্গীত বা গান্ধর্ববিদ্যা (অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য) এবং নাট্য বা অভিনয় অতিপ্রাচীন কাল অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই অতি জনপ্রিয় শিক্ষণীয় বিদ্যারূপে গভীরভাবে অনুশীলিত হত। সুরই হলো ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ভিত্তি বা আদর্শ। সুর বা মেলোডিকে ঘিরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বিশাল আয়তন গড়ে উঠেছে।

ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণের প্রচলন দেখা যায়। কৌষীতকি ব্রাহ্মণের (২৯/৫) বিবরণ থেকে জানা যায় কতকগুলি বৈদিক সূক্তের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য, গীত ও বাদ্য। যজুর্বেদে ৩০ অধ্যায়ে ১৯ এবং ২০ মন্ত্রতে অনেক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ছিল, যাতে বোঝা যায় ঐ সময় বাদ্যবাদনের প্রচলন ছিল। নৃত্য, গীত ও বাদ্য-এর একত্র মিলনেই সঙ্গীত সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকর' ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের স্বরগতাধ্যায়-এর (পদার্থ সংগ্রহ)-২১ নং শ্লোকে বলেছেন—

নির্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেবঃ সারোদ্ধারমিমং ব্যধাত্।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্তং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।। ১। ২১।।

তিনি এই গ্রন্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে সঙ্গীত বলে মনে করেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার আদিমযুগে সঙ্গীত ছিল মানুষের মনের অন্তরতম দেশে লুকানো। প্রকৃতির প্রজা পশুপক্ষিদের কলকণ্ঠে ছিল গানের রূপ অভিব্যক্ত। মানুষ চিরদিনই অনুকরণ-প্রিয়। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমানের সার্থকতা সে বুঝত, দুঃখ-বেদনার মধ্যে শান্তির আশায় ঈশ্বরকে জানাতো তাই সে প্রাণের গোপন কথা। সুর থাকত সেই কথায়, বিচিত্র স্বরের সমাবেশ না থাকলেও একটি বা দুটি বা তিনটি স্বরে ও সরস ছন্দে গানের নৈবেদ্য সাজাত সুপ্রাচীনকালের মানুষ। নিরর্থক ছিল না তাদের গানের ভাষা। পরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গানের রূপে এলো বিবর্তন, ভাবসম্পদে সঙ্গীত হল পূর্ণ ও অপার্থিব আদর্শকে মানুষ গ্রহণ করলো সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির মান ও রূপ যেমন হয় উন্নত, সঙ্গীতের পক্ষে ঠিক সেইরকমই।

ভারতীয় সঙ্গীত ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতারই একটি অপরিহার্য উপাদান, সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের কথা আমরা ব্রাহ্মণসাহিত্য আলোচনা পেয়েছি।

সঙ্গীতের রূপ ছিল গোড়াকার দিকে সহজ ও সরল, প্রার্থনা ও আন্তর আবেদনের আকারে হত তা রূপায়িত। স্তোত্র গান তথা উদ্‌গান, গাথা প্রভৃতি ছিল সঙ্গীতের রূপ। বৈদিক যুগে কটি শ্রেণী বা জাতির গানের বিকাশ ছিল। এই শ্রেণী বা জাতিগুলি স্বরের বিভিন্ন সংখ্যাকে নিয়ে ছিল সার্থক।

যেমন—

আর্চিক—একস্বরের গান

গাথিক—দুইস্বরের গান

সামিক—তিনস্বরের গান

স্বরান্তর—চারস্বরের গান

ঔড়ব—পাঁচস্বরের গান

ষাড়ব—ছয়স্বরের গান

সম্পূর্ণ—সাতস্বরের গান

আর্চিক ও গাথিক গানের বিকাশ ও অনুশীলন একেবারে আদিম জাতিদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ, একথা অনুমান করা যায়। (Vide Prehistoric India 1950 P. 270-71)

প্রাচীন যুগে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গীত ও সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদীর পাশে অগ্নিতে আহুতি দেবার সময় বিচিত্র স্বরে ও ছন্দে সামগান করতেন। সেই সামগানই বিশ্বসঙ্গীতের মূল উৎস। প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীত অন্যান্য সুলভ দেশে আমদানি হয় এবং তারই জন্য ভারতের সকল দেশ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত ধারার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। যুদ্ধবিগ্রহ ধর্মপ্রচার ও পরস্পর সাংস্কৃতিক যোগসূত্রই হলো সকল জাতির ভিতর সঙ্গীতকলা বিস্তারের অন্যতম কারণ।

সঙ্গীত ইতিহাসের কালবিভাগ ঃ ভারতের সমগ্র সাংগীতিক ইতিহাসকে আমরা মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করতে পারি ও সেই তিনটি ভাগ হলো ঃ- (১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্য যুগ ও (৩) বর্তমান যুগ। (১) প্রাচীন যুগের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আদিম (Primitive), প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাগ্বৈদিক (Prehistoric or Prevedic), বৈদিক (Vedic) ও সাংস্কৃতিক (Classical) যুগের ধারা। সুতরাং প্রাচীন যুগের কাল-পরিমাণ নির্ধারিত হবে অনুর্বর আদিম যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় ১১৫০—১২০০ শতক, (২) মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ১৩০০ খ্রীষ্টীয় ১৮০০ শতক এবং (৩) বর্তমান যুগের খ্রীষ্টীয় ১৯০০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকে একটু ভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে—

(১) হিন্দুযুগ—বৈদিক কাল থেকে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক

(২) মুসলমান-যুগ—খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক থেকে ১৮শ শতক

(৩) ইংরাজ-যুগ—খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতক থেকে বর্তমান কাল।

তবে পূর্বোক্ত বিভাগই সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন এবং নানান দিক থেকে তা যুক্তিসঙ্গত। (Cf. India through ages 1951 p. 2)

বৈদিকগান ও বাদ্যযন্ত্র ঃ-

বৈদিক সাহিত্যে তথা সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, আরণ্যক ও উপনিষদে ধর্ম, শ্রৌত ও কল্পযুগে, শিক্ষায় ও প্রাতিশাখ্যে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক প্রয়োগ অনুযায়ী গানের অনুশীলন হত, কাজেই বৈদিক যুগে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ বিকাশ ছিল অব্যাহত। যদিও 'সঙ্গীত' শব্দটির পরিবর্তে তখন গান, উদ্‌গান, উদ্‌গীতি, স্তোত্র, প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার দেখা যায়। ঋক্, সাম, যজু , অথর্ব ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিচিত্র রকমের বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়।

গানের সঙ্গে থাকত নৃত্য ও বাদ্য, ৫/৩৩/৬ ঋকে আছে "**पपृक्षेण्यमिन्द्र त्वे ह्मोज्यो नृम्णानि च नृतमानो अमर्त:**"। গীত ছাড়া পৃথক্‌ভাবে নৃত্যের তখন অনুশীলন হত। দুন্দুভি প্রভৃতি চামড়ার বাদ্য, বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত

বীণা, বেণু প্রভৃতির উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। দন্দুভি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী হত। যুদ্ধে বিপদাশঙ্কায় ও বিভিন্ন উৎসবে ঘোষণা করার জন্য দুন্দুভি ব্যবহার করা হত। ঋগ্‌বেদে (১/২৮/৫) আছে **यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उल्खुल्क युस्यसे। इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः।** ৬/৪৭/২৯-৩১ ঋক্ মন্ত্রগুলিতে শত্রু দমন ও শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য দুন্দুভিকে মন্ত্রে আহ্বান করা হত। ৬/৪৭/২৯ ঋকে আছে '**स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैर्दूराद्दवीयो अप सेध शत्रून्...**' ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে 'গর্গর' নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৮/৬৯/৯ ঋকে আছে

'अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्।

पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्।।'

এই মন্ত্রে 'গর্গর' ছাড়াও 'পিঙ্গা' বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। 'গর্গর' সম্বন্ধে সায়ণ বলেছেন '**गर्गरो गर्गरध्वनियुक्तो वाद्यविशेषः**'। 'পিঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রটি 'ধনুর্যন্ত্র', একে রাবণাস্ত্রও বলে। এই পিঙ্গ ধনুর্যন্ত্রই (Bow = Instrument) পরবর্তীকালে রূপ পরিবর্তন করে 'বাহুলীন' বা 'বেহালা' নামে পরিচিত।

বেদে 'আঘাটি, ঘাটলিকা (ঘাতলিকা), কাণ্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি' প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে শততন্ত্রীবীণার উল্লেখ আছে।

সপ্তসুর ঃ-

আগের ত্রিস্বর বিশিষ্ট বৈদিক সংগীত ধীরে ধীরে স্বরসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সপ্তস্বরে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে চার স্বর, তারপরে পাঁচ স্বর তারপর ছয় স্বর এইভাবে বেড়ে সাতের কোঠায় উত্তীর্ণ হতে স্বরগ্রাম একটা পরিণতি পেল এবং এক আদর্শ স্থানীয় স্বরসপ্তকের জন্ম হলো। নারদীয় শিক্ষায় সামগানের সাতটি স্বরকে সঙ্গীতের সাতটি স্বরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক সংগীতের সেই স্বর হলো, যথা—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। সুতরাং সামবেদ হলো সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান। পণ্ডিতদের মতে তিনস্বর থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের সপ্তস্বরে পরিণতি লাভ করতে কমপক্ষে একহাজার বছর লেগেছিল। W.W. Hunter মনে করেন পাণিনির আবির্ভাবের (খ্রী পূ ৩২০) আগেই ভারতীয় সঙ্গীত সপ্তস্বরে সুগঠিত হয়ে গিয়েছিল ও তার বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল।

षड्जश्च ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा।

पञ्चमो धैवतश्चैव सप्तमश्च निषादवान्।। (नाट्यशास्त्र २८,२२)

এই সপ্তস্বরের সরাসরি প্রচলন সামবেদ থেকে পাই। তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রের ২৮তম অধ্যায়তে এর ব্যবহার পাই। এই সাতটি সুর ২২টি শ্রুতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়।

নাদ

এই যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রথাবদ্ধ আলোচকেরা সুরের স্থির গম্ভীর ভাব বোঝানোর জন্য 'নাদব্রহ্ম' নামক একটি শব্দের প্রায়শঃ প্রয়োগ করেন সেটির ধর্মীয় প্রেক্ষাপট আমরা মানি বা না মানি একথা স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় সঙ্গীতের মৌলিক প্রকৃতি পরিস্ফুট করে তোলার জন্য 'নাদ' কথাটির চেয়ে সমাধিক উপযুক্ত শব্দ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতীয় সঙ্গীতের সুর আসলে এই নাদ এর প্রতিরূপ। যখন কোন সঙ্গীত সভাগৃহে

কোনো প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ যন্ত্র বা কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন, তখন একমাত্র সঙ্গীতের অনুকরণ ভিন্ন পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ গৃহে আর কোনো শব্দধ্বনি শ্রুত হয় না। সেই অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রোতার সচরাচর যে অনুভব হয় তা হলো পারিপার্শ্বিক আবহের সঙ্গে পরিবেশিত সুরের সম্পূর্ণ মিলে যাওয়া, লীন হয়ে যাওয়া। চতুস্পার্শ্বস্থিত আবেষ্টনীয় অন্তর্নিহিত স্তব্ধতার সঙ্গে সুরের এই যে একাত্মতা, একীভবন এরই অন্য নাম 'নাদব্রহ্ম'। শিব তাণ্ডবনৃত্যকালে চতুর্দশবার যে ঢক্কানিনাদ করেছিলেন তার থেকেই নাদ সৃষ্টি হয়েছে। 'রুদ্রডমরুদ্ভবসূত্রবিবরণে' বলা হয়েছে যে ঐ চতুর্দশ নাদই সঙ্গীতের উৎস। বৈদিক যুগে যে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রচলন ছিল তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গীতের প্রচারকের ভূমিকায় নাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বৈদিকোত্তর সাহিত্যে প্রাচীন সঙ্গীতের চর্চাকারদের অনেকের নাম উল্লেখিত—সদাশিব, ব্রহ্মা, মাতঙ্গ, দুর্গা, কোহল, কম্বলো, আর্জুন, কশ্যপমুনি, যাষ্টিক, শার্দূল, দত্তিল, নারদ, তুম্বুরু, আঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, রাবণ, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি এদের উল্লেখ শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সঙ্গীতবিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। যথা—

১। গন্ধর্বামৃতসাগর (ব্রহ্মার নামে প্রচলিত)

২। গীতালঙ্কার (ভরত রচিত, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে ভিন্ন)

৩। বৃহদ্দেশী (মকরন্দ রচিত, ৮৫০ খ্রীঃ)

৪। সঙ্গীতরত্নাকর (শার্ঙ্গদেব রচিত, খ্রীঃ ১২শ শতক)

৫। সঙ্গীতমকরন্দ (নারদের নামে প্রচলিত)

৬। সঙ্গীতরত্নাবলী (সোমভূপাল রচিত)

৭। সঙ্গীত পারিজাত (অহোল রচিত)

৮। সঙ্গীত চূড়ামণি (জগদেকমল্ল রচিত)

৯। মানসোল্লাস (সোমেশ্বর রচিত)

১০। সঙ্গীতকল্পতরু (ভোজ, রুচিপতি ও রঙ্গনাথ প্রত্যেকেই এই নামে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের প্রণেতা)

১১। যষ্টিকামত (পুঁথি)

১২। সঙ্গীতদর্পণ (দামোদরমিশ্র রচিত)

১৩। দত্তিল (দত্তিল মুনির নামে প্রচলিত)

১৪। অভিনবরাগমঞ্জরী (বিষ্ণুশর্মা রচিত)

১৫। সঙ্গীতরত্নাবলী (জয়ন রচিত, খ্রী ১৩শ শতক)

১৬। সঙ্গীতসময়সার (পার্শ্বদেব রচিত)

১৭। সঙ্গীতকল্পদ্রুম (লেখক অজ্ঞাত)

১৮। রাগচন্দ্রিকাসার (বিষ্ণুশর্মা রচিত)

১৯। রসতত্ত্বসমুচ্চয় (অল্লরাজ রচিত)

২০। সঙ্গীতসারকলিকা (মোক্ষদেব রচিত)

২১। সঙ্গীতপারিজাত (আহোবল রচিত)

২২। সঙ্গীতরাজ (রাণাকুম্ভ রচিত)

২৩। সঙ্গীতদামোদর (শুভঙ্কর রচিত)

২৪। সঙ্গীতদীপিকা (মধ্যভট্ট রচিত, লুপ্ত)

২৫। আনন্দসঞ্জীবন (মদন রচিত, খ্রীঃ ১৪শ শতক)

২৬। সঙ্গীতচন্দ্র (বিপ্রদাস কৃত এই গ্রন্থের 'নৃত্যপ্রকাশ' নামক পরিচ্ছেদটি ও একটি টীকা পাওয়া যায়, খ্রীঃ ১৪শ শতক)

২৭। সঙ্গীতসুধাকর (হরিপালদেব রচিত, খ্রীঃ ১৪শ শতক)

২৮। সঙ্গীতসর্বস্ব (জগদ্ধর রচিত, খ্রীঃ ১৪শ শতক)

২৯। সঙ্গীতমুক্তাবলী (দেবনাচার্য রচিত, খ্রীঃ ১৫শ শতক)

৩০। সঙ্গীতমণ্ডল (মণ্ডলকৃত, খ্রীঃ ১৫শ শতক)

৩১-৩২। ষড়্রাগচন্দ্রোদয় ও রাগমালা (পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল, খ্রীঃ ১৬শ শতক)

৩৩। সঙ্গীতসূর্যোদয় (লক্ষ্মীনারায়ণ রচিত, খ্রীঃ ১৬শ শতক)

৩৪। স্বরমেলকবিধি (রাম অমাজকৃত, খ্রীঃ ১৬শ শতক)

৩৫। রাগমালা (ক্ষেমকর্ণ রচিত, খ্রীঃ ১৬শ শতক)

৩৬। রাগবিবোধ (সোমনাথ প্রণীত, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

৩৭। সঙ্গীতসারসংগ্রহ (জগজ্জ্যোতির্মল্ল, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

৩৮। সঙ্গীতদর্পণ (চতুরদামোদর কৃত, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

৩৯। সঙ্গীতসারামৃত (তুলারাজ কৃত, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

৪০। রাগমালিকা (পুরুষোত্তম কৃত, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের গভীর সংযোগ তথা নৃত্যের বিবিধ প্রণালী বিশদভাবে আলোচিত। একাধিক পুরাণে নৃত্যবিষয়ের প্রাচীন আচার্যদের মতগুলি সঙ্কলিত—অগ্নিপুরাণ ৩৪১, বায়ুপুরাণ ২৪—২৫, মার্কণ্ডেয় ২১, বিষ্ণুধর্মোত্তর ৩২-৩৪।

নৃত্যবিষয়ক অনান্য রচনা ঃ

১। ভরতার্ণব (নন্দিকেশ্বর প্রণীত)

২-৪। ব্রহ্মভরত, নন্দিভরত ও সদাশিবভরত শীর্ষক তিনটি গ্রন্থের নামমাত্র উপলব্ধ হয়।

৫। অভিনয়দর্পণ (নন্দিকেশ্বরের এই গ্রন্থে নৃত্যের বিবিধ শৈলী আলোচিত)

৬। তালাধ্যায় (আচার্য কোহলের নামে প্রচলিত)

৭। নৃত্যাধ্যায় (অশোকমল্ল রচিত, খ্রীঃ ৮৫০)

৮। নৃত্যরত্নাবলী (জয়সেন রচিত, খ্রীঃ ১৩শ শতক)

৯। নৃত্যরত্নকোষ (রাণাকুম্ভ রচিত, খ্রীঃ ১৩শ শতক)

১০। সঙ্গীতোপনিষৎ–সারোদ্ধার (সুধাকলশ ১৩৫০ খ্রীঃ)

১১। নাট্যচূড়ামণি (সোমল রচিত, খ্রীঃ ১৪শ শতক)

১২। তালদীপিকা (গোপেন্দ্র তিপ্পভূপাল কৃত, খ্রীঃ ১৫শ শতক)

১৩। তালকলাবোধ (অচ্যুত রায় রচিত, ১৫৪৩ খ্রীঃ)

১৪। তালকলাবিলাস, নৃত্যচূড়ামণি ও সঙ্গীতার্ণব (পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত, কিন্তু বর্তমানে লুপ্ত)

১৫। হস্তমুক্তাবলী (শুভঙ্কর রচিত, খ্রীঃ ১৬শ শতক)

১৬। সঙ্গীতদামোদর (পূর্বোক্ত লেখকের রচনা)

১৭। নর্তননির্ণয় (পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল)

১৮। নাট্যবেদাগম (তুলারাজ রচিত, খ্রীঃ ১৭শ শতক)

যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে রচিত গ্রন্থমালা -

১। উড্ডীশ-মহামন্ত্রোদয় ও

২। চতুর্দণ্ডি প্রকাশ (বেঙ্কটমখী রচিত, খ্রীঃ ১৭শত শতক)

৩। বীণালক্ষণ

৪। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের ১৭শ ও ১৯শ অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রের পূর্বোক্ত শাখাগুলি চারুকলারূপে সুমহান আদর্শের তত্ত্ব ও প্রয়োগ শিল্পের (Performing Arts) কৌশলের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে যুক্ত।

সঙ্গীতরত্নাকর

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকে রচিত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি সাত অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার কতকগুলি প্রকরণে বিভক্ত। সাতটি অধ্যায়ের নামকরণের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় স্পষ্ট। এই অধ্যায় সাতটি—(১) স্বর, (২) রাগ, (৩) প্রকীর্ণক, (৪) প্রবন্ধ, (৫) তাল, (৬) বাদ্য, (৭) নৃত্য।

এই স্বরের আবার আটটি ভাগ— (১) পদার্থ সংগ্রহ, (২) পিণ্ডোত্পত্তি, (৩) নাদ-স্থান-শ্রুতি-স্বর-জাতি-কুল-দৈবতর্ষিচ্ছন্দোরস (৪) গ্রাম-মূর্ছনা-ক্রম-তান (৫) সাধারণ, (৬) বর্ণালঙ্কার (৭) জাতি (৮) গীতি।

(১) **স্বরাগম** - সঙ্গীতের শ্রুতি, স্বর প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার শ্রুতির দ্বাবিংশতি ভেদ আলোচনা করেছেন। এই শ্রুতি থেকেই স্নিগ্ধ ও অনুরণনাত্মক স্বরের উদ্ভব, আর এই স্বরই শ্রোতার মনকে সহজে আকৃষ্ট করতে সমর্থ।

श्रुत्यनन्तरभावी य: स्निग्धोऽनुरणनात्मक:।

स्वतो रञ्जयति श्रोतृचित्तं स स्वर उच्यते।

ननु श्रुतिश्चतुर्थ्यादिरस्त्वेवं स्वरकारणम्।। (१। ३। २४)

(২) **রাগাধ্যায়**—বিভিন্ন রাগের লক্ষণ ও উদাহরণ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। স্বর থেকেই রাগের উদ্ভব।

(৩) **প্রকীর্ণকাধ্যায়**—এই অধ্যায়ে বাগ্গেয় স্বরের লক্ষণ, গায়ন ভেদ, শব্দ ভেদ প্রভৃতি আলোচনার পর

গ্রন্থকার গমক, স্থায়ী, আলপ্তি প্রভৃতির লক্ষণ এবং সঙ্গীতে এগুলির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেছেন।

(৪) **প্রবন্ধাধ্যায়** গীতের সংজ্ঞা, গান্ধর্ব ও গান ভেদে গীতের দ্বৈবিধ্য, প্রবন্ধের সংজ্ঞা, প্রবন্ধের উপাদান, গীতের গুণ ও দোষ প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(৫) **তালাধ্যায়** এই অধ্যায়ে তাল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রতিপাদন প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

তালস্তলপ্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্।। ২।।

মার্গতাল, গীতক, দেশীতালসমূহের ভেদ ও লক্ষণ এই অধ্যায়ের প্রাতিপাদ্য বিষয়।

(৬) **বাদ্যাধ্যায়** — সঙ্গীতের অপরিহার্য সহায়ক হল বাদ্য। এই বাদ্য আবার দ্বিবিধ-বংশী, বীণা প্রভৃতি সুরসঞ্চারক বাদ্য এবং মৃদঙ্গাদি তালসঞ্চারক বাদ্য। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের লক্ষণ এবং তাদের উপযোগিতা এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

শ্রুতাদয় এব দ্বারং মুখং তস্মাদ্ গীতং ভবেত্, সংগীতমুত্পদ্যত ইত্যর্থঃ।
তত্র তত্র নাদসাম্যং যথা ভবতি তথা ধ্বননেন রক্তাতিশয়যুক্তং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ।।

ঘনবাদ্যাল্লঘ্বাদিক্রিয়য়া সংমিতং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। এবং চতুর্বিধানামপি বাদ্যনাং গীত এবোপকারকত্বমবগন্তব্যম্।। কলানিধি।। স.র. ৬। ৩,৪।।

(৭) **নৃত্যাধ্যায়** — বিভিন্ন প্রকার নৃত্য এবং অভিনয়ের আলোচনায় এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সঙ্গীতরত্নাকরে বর্ণিত রাগ ও তালের সঙ্গে বর্তমানের রাগ ও তালের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতকে মার্গ ও দেশীভেদে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মার্গসঙ্গীত হলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যা সঙ্গীত শাস্ত্রের ব্যাকরণকে অনুসরণ করে গাওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালের খেয়াল, গজল, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতি মার্গসঙ্গীতের অর্ন্তগত।

সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতের সঙ্গীতশাস্ত্রের ইতিহাস নির্মাণে এইরূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদচর্চা

অগ্নিভা ব্যানার্জী

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎশাস্ত্ররূপে আয়ুর্বেদের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। কোন ব্যক্তি স্বল্পায়ু হবে না দীর্ঘায়ু হবে, সে স্বাস্থ্যবান্ হবে না রোগযুক্ত আয়ু নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে— এ সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় আয়ুর্বেদ থেকে। জীবনের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মূলে আছে সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীর। স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্যহীনতা ও রুগ্নতা জীবনসংগ্রামে ব্যর্থতার মূল কারণ। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्।
रोगास्तस्यापहर्तारं श्रेयसो जीवितस्य च।।

আয়ুর্বেদ অথর্ববেদীয় উপাঙ্গ। আয়ুর্বেদের মূল অথর্ববেদে নিহিত আছে। অশ্বিযুগলের চিকিৎসানৈপুণ্যের বহু প্রশংসা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় এবং ঔষধিগণের রোগনিবারণশক্তির অনেক প্রশংসা ও স্তুতি বেদে আছে।

আয়ুর্বেদের প্রয়োজন

शरीरं व्याधिमन्दिरम্— মানুষের শরীরমাত্রেই ব্যাধির আকর। মানুষমাত্রেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম কমবেশী লঙ্ঘন করে থাকে। তাছাড়া মানুষকে কাল, ঋতু ও প্রকৃতির খেয়াল সহ্য করে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এর ফলে শরীরনির্মাণকারী ধাতুসমূহ বিকৃত হয়। শরীরের উপর কোন অত্যাচার না করা সত্ত্বেও তাই মানুষ নানাপ্রকার ব্যাধিতে পীড়িত হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম পালন করলেও ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। আয়ুর্বেদমাত্রেই নিহিত আছে ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় আনার নানা উপদেশ। বিভিন্ন রোগের কারণ এবং সেগুলির প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ও নির্দিষ্ট হয়েছে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—

... कार्यं धातुसाम्यमिहोच्यते।
धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्।। (चरकसंहिता-१.१.५३)

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে এক লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে অল্পায়ু ও স্বল্পধী দেখে সেই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান করেন বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্যকে। প্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিশেষ শাস্ত্র অধিগত হন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় এই শাস্ত্রের বিশারদ আচার্যদের নাম পাই— ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, জাতুষ্কর্ণ, ভেল, হারীত, ক্ষারপাণি, ধন্বন্তরি প্রভৃতি। বৈদিক সূর্য ও রুদ্র দেবতাগণ, দুই অশ্বিনীকুমার এবং পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব প্রভৃতি রোগনিরাময়ের অধিকারিকরূপে জনপ্রিয়। চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতারূপে দেবতাদের নাম উল্লিখিত রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে—

১. অশ্বিনীকুমারদের রচনারূপে প্রচলিত দুটি গ্রন্থ 'অশ্বিনীসংহিতা' ও 'নাড়ীনিদান'।

২. অজ্ঞাতনামা লেখক প্রণীত 'ধাতুরত্নমালা' গ্রন্থে অশ্বিনীকুমারসংহিতা নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৩. শিবপ্রণীত 'কৈলাশকারক' ও 'বৈদ্যরাজতন্ত্র' নামক দুটি রচনা।

৪. চক্রপাণিদত্ত 'শৈবসিদ্ধান্ত' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

৫. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 'চিকিৎসাসারতন্ত্র' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যার প্রণেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভাস্করসংহিতা নামক অপর গ্রন্থেরও নাম উপলব্ধ হয় এই পুরাণে।

৬. বাহটসংহিতা গ্রন্থটি শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়। ঋগ্‌বেদে, বিশেষতঃ অথর্ববেদের ভৈষজ্যবিদ্যার বহু মন্ত্রে গাছ-গাছড়ার প্রয়োগে চিকিৎসার বিধান আলোচিত। অথর্ববেদের 'ভৈষজ্যসূক্ত'-সমূহ প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থ রূপে মর্যাদা লাভের অধিকারী। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দ্বারা বিভক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র হল—

১. শল্যতন্ত্র (Major Surjery)

২. শালাক্যতন্ত্র (Minor Surgery)

৩. কায়চিকিৎসা (Therapeutics)

৪. ভূতবিদ্যা (Demonology)

৫. কুমারভৃত্য (Paediatrics)

৬. অগদতন্ত্র (Toxicology)

৭. রসায়ন (Elixir)

৮. বাজীকরণ (Aphrodisiacs)।

প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা রোগনির্ণয়, রোগের প্রতিবিধান ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন। পুরাণসমূহে এরূপ কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

১. ধন্বন্তরি প্রণীত চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান

২. দিবোদাস প্রণীত চিকিৎসা-দর্শন

৩. নকুল প্রণীত বৈদ্যকসর্বস্ব

৪. কাশীরাজ প্রণীত চিকিৎসা-কৌমুদী।

দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় সুবিশাল এই আয়ুর্বেদশাস্ত্র কোন একজন মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই এক একটি তন্ত্রকে অবলম্বন করে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। আয়ুর্বেদের এই সম্প্রদায়গুলি হল—

১. আত্রেয় সম্প্রদায়, ২. ধন্বন্তরি সম্প্রদায়, ৩. শালাক্য সম্প্রদায় ৪. ভূতবিদ্যা তান্ত্রিক সম্প্রদায়, ৫. কৌমারভৃত্য সম্প্রদায়, ৬. অগদতান্ত্রিক সম্প্রদায়, ৭. রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় ৮. বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ভারতে আয়ুর্বেদের বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্বেদসংহিতার রুদ্রসূক্তে বলা হয়েছে—

ত্বাদতেভী রুদ্র শন্তমেভি: শতং হিমা অশীয ভেষজেভি:।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচী:।। (২.৩৩.২)

অর্থাৎ হে রুদ্র আমরা যেন তোমার দেওয়া সুখকর ওষধি দ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, আমাদের পাপ নির্মূল কর এবং শরীরের সকল ব্যাধি দূর কর।

অথর্ববেদের ভৈষজ্যমন্ত্র, আয়ুষ্যমন্ত্র, প্রভৃতির মধ্যে নিহিত আছে আয়ুর্বেদের উৎস। অথর্ববেদের ঋষিরা রোগব্যাধির নেপথ্যে বিশেষ অসুরের কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। অশ্মরীরোগ, শূলবেদনা, উদরী, চক্ষূরোগ, বাত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। দীর্ঘ নীরোগ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভের জন্য আয়ুষ্য মন্ত্রের প্রয়োগ করা হত। এই ধরনের একটি মন্ত্রে দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের মত প্রাণকে অভয় দান করা হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বৈদিক ঋষিদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুদ্ধে ছিন্ন বিশুপলার পদদ্বয়ে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলেন। বৈদিকযুগে বন্ধ্যাত্বকরণ এবং মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসাবিদ্যারও বিশেষ চর্চা হত। তাই V. Varadachari মন্তব্য করেছেন— "Surgery was practised including major operations like amputation, laporotomy and trephining of the skull." প্রাচীন সাহিত্যে এমন কিছু ঋষির নাম পাওয়া যায় যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশদান করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহর্ষি আত্রেয়। আত্রেয়-কেই এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকরূপে গণ্য করা যায়।

মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ-এর কাছ থেকে কায়চিকিৎসা বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করে তা নিজ শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনিই আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। চরকসংহিতায় তিনজন আত্রেয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে— ১. অত্রিপুত্র আত্রেয়, ২. কৃষ্ণাত্রেয় এবং ৩. ভিক্ষু আত্রেয়। অত্রিপুত্র আত্রেয় চরকসংহিতার প্রধান বক্তা। ইনি অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুষ্কর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি— এই ছয়জন তন্ত্রকারের গুরু। কৃষ্ণাত্রেয় ছিলেন শালাক্য তান্ত্রিক গ্রন্থকার। চরকসংহিতার বিভিন্ন টীকাকার কৃষ্ণাত্রেয় থেকে পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করেছেন। ভিক্ষু আত্রেয় অত্রিসংহিতার প্রণেতা বৌদ্ধ চিকিৎসক। ইনি বিম্বিসারের চিকিৎসক এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক জীবক এঁরই তত্ত্বাবধানে আয়ুর্বেদীয় শালাক্য ও শিশুরোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

আয়ুর্বেদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্রকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে আটটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি সম্প্রদায়ে এমন কিছু কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন যাঁদের রচিত আয়ুর্বেদবিষয়ক গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রথিতযশা সেই আয়ুর্বেদবেত্তাদের রচিত কিছু কালাতিশায়ী গ্রন্থের প্রতি আলোকপাত করলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাস কিছুটা স্পষ্ট হবে।

চরকসংহিতা

(চরক কর্তৃক সংকলিত, আনুমানিক খ্রী প্রথম শতক)

কায়চিকিৎসার প্রাচীন আচার্য আত্রেয়, তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ছয় জন শিষ্য— অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুষ্কর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত। শিষ্যগণ প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা-গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু সেগুলি লুপ্ত। অগ্নিবেশ রচিত সংহিতার বিশুদ্ধ সংস্করণ চরকসংহিতা। অথর্ববেদের পর থেকে উপনিষদ্ যুগের শেষ পর্যন্ত 'অগ্নিবেশতন্ত্র'-ই আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান গ্রন্থ ছিল। কালের করাল গ্রাসে ও দীর্ঘকাল উপযুক্ত চর্চার অভাবে আয়ুর্বেদচর্চার অভাবে সমাজে অকালমৃত্যু, জরা ও ব্যাধির প্রকোপ দেখে অহিপতি ভগবান শেষনাগ চরকরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে লুপ্তপ্রায় অগ্নিবেশতন্ত্রের সংস্কার সাধন করেন। চরকের নামানুসারে সেই গ্রন্থ 'চরকসংহিতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, উপলভ্যমান চরকসংহিতা কোন একক ব্যক্তির রচনা নয়। এই অনুমান অমূলক নয়। কারণ চরকসংহিতার শেষে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই গ্রন্থটি অগ্নিবেশকর্তৃক রচিত, চরককর্তৃক প্রতিসংস্কৃত এবং মহাত্মা দৃঢ়বলের দ্বারা পরিপূরিত। চরকসংহিতার চিকিৎসা স্থানের ত্রিংশ অধ্যায়েও বলা হয়েছে—

অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্পাঃ সিদ্ধয় এব চ।
নাসাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরকসংস্কৃতে।।
তানেতান্ কাপিলবলিঃ শেষান্ দৃঢ়বলোঽকরোত্।
তন্ত্রস্যাস্য মহার্থস্য পূরাণার্থং যথাতথম্।। (১১১,১১২)

অর্থাৎ চরকের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতার চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় এবং সম্পূর্ণ কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান বিনষ্ট হওয়ায় পরবর্তীকালে কপিলের পুত্র দৃঢ়বলের দ্বারা তা পরিপূরিত হয়। কাজেই চরকসংহিতার রচয়িতা অগ্নিবেশ, প্রতিসংস্কর্তা চরক এবং পরিপূরক দৃঢ়বল।

চিকিৎসাশাস্ত্র হিসাবে চরকসংহিতা আজও সর্ববৃহত্ এবং সর্বতথ্যসমন্বিত। এই সংহিতার ৮টি অংশ— ১. সূত্রস্থান, ২. নিদানস্থান, ৩. বিমানস্থান, ৪. শারীরস্থান, ৫. ইন্দ্রিয়স্থান, ৬. চিকিৎসাস্থান, ৭. কল্পস্থান, ৮. সিদ্ধিস্থান।

১. **সূত্রস্থান ঃ** খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তিন ভেদে দ্রব্য বিশ্লেষণ।

উদ্ভিজ্জভেদ ঃ বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি।

প্রাণিজভেদ ঃ জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ।

খনিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যগুলির রোগনিরাময়ের জন্য প্রয়োগ, মিশ্রণজাত ফল এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচিত। প্রাণিজ বস্তুর জন্ম, প্রকৃতি, অবস্থান, অন্যান্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ তথা জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় তাদের বিক্রিয়া আলোচিত।

২. **নিদানস্থান ঃ** বিবিধ ব্যাধির আলোচনা, রোগের মুখ্য ও গৌণ কারণ, সংক্রমণ, প্রসার, পরিবর্তন প্রভৃতির বিশদ বিবরণ।

৩. **বিমানস্থান ঃ** মানবদেহে ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা ভৌতিক দেহের উপাদান, মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা।

৪. **শারীরস্থান ঃ** মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য (Anatomy and Physiology)

৫. **ইন্দ্রিয়স্থান ঃ** মানবদেহ ও মনের লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যতের আধি-ব্যাধি বিষয়ক আশঙ্কা ও তার ফল।

৬. **চিকিৎসাস্থান ঃ** মানবশরীরের বিবিধ রোগ, সেগুলির উপশম, ভৈষজ্য-চিকিৎসার উপাদান, প্রস্তুতপ্রণালী, ভৈষজ্য ও ধাতব উপাদানের মিশ্রণ ইত্যাদির বিবরণ।

৭ - ৮. কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান ঃ

চিকিৎসকের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে আনুপূর্বিক সবিস্তার আলোচনা সন্নিবিষ্ট।

আত্রেয়কথিত ও অগ্নিবেশ-চরক সংকলিত 'চরকসংহিতা' প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ ও আরোগ্যবিষয়ক সম্পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য রচনা। এই গ্রন্থের বহু টীকা ও টিপ্পনী রচিত হয়েছিল

ক. ভট্টারহরিচন্দ্র কৃত চরকটীকা (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক)

খ. আষাঢ়বর্ষা কৃত পরিহারবার্তিকা (খ্রী. ৯ম শতক)

গ. জেজট কৃত নিরন্তর-পদব্যাখ্যা (খ্রী. ১০ম শতক)

ঘ. চক্রপাণিদত্ত কৃত টীকা আয়ুর্বেদদীপিকা (খ্রী. ১১শ শতক)

ঙ. কার্ত্তিক, গয়দত্ত, তীসট ও চন্দ্রট কৃত পৃথক্ পৃথক্ টীকা (১০ম - ১৬শ শতক)

চ. বাংলার প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য শিবদাস সেন কৃত চরকতত্ত্বদীপিকা (খ্রী. ১৬শ শতক)

ছ. বাংলার টীকাকার গঙ্গাধর রায় কৃত জল্পকল্পতরু (১৮শ শতক)

জ. বাংলার টীকাকার যোগীন্দ্রনাথ সেন কৃত চরকোপস্কার (২০শ শতক)

ঝ. বাংলার টীকাকার দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কৃত টীকাটি সর্বাধুনিক।

নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন তার সবই চরক সংহিতায় আলোচিত হয়েছে। হিমালয়ের মতো বিশাল ও মহাসমুদ্রের মতো দুরধিগম্য এই গ্রন্থটিকে সর্ববিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু চিকিৎসাগ্রন্থ হিসাবে নয়, মানুষের সার্বিক মানসিক উন্নতির জন্য যা কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ হয়েছে চরকসংহিতায়। ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মানুষের সর্ববিধ রোগের মূলে আছে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রভাব—'वायु: पित्तं कफश्चोक्त: शारीरो दोषसंग्रह:'। চরক মানুষের সকল ব্যাধিকে আগ্নেয়, সৌম্য ও বায়ব্য ভেদে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর পূর্বসূরীরা যে রাজস ও তামসভেদে ব্যাধিসমূহকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে রাজযক্ষাকে একাদশ ব্যাধির সম্মেলন বলা হয়েছে। চরকসংহিতা গ্রন্থের উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে—

'চিকিতসিতং বহ্নিবেশ স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।

যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তত্ক্বচিত্।। সিদ্ধি। ১২ অধ্যায়। ৩৩।।'

অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তি ও রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে অগ্নিবেশ চরকসংহিতায় যা বলেছেন তা অপরাপর চিকিৎসাক্ষেত্রে থাকতে পারে, কিন্তু চরকসংহিতায় যা নেই তা অন্য কোথাও নেই।

চরকসংহিতা যে এককালে বহুল সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ এই গ্রন্থের ওপর রচিত অসংখ্য টীকা। চরকসংহিতার টীকাকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—চক্রপাণি দত্ত, শিবদাস, গঙ্গাধর, ঈশ্বর সেন, শ্রীকণ্ঠ, ঈষাণদেব, জিনদাস, ব্রহ্মদেব, ইন্দুকর প্রভৃতি।

সুশ্রুতসংহিতা

(সুশ্রুতকর্তৃক সংকলিত, আনুমানিক খ্রী. ৫ম-৬ষ্ঠ শতক)

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে চরকসংহিতার পরেই সুশ্রুতসংহিতার স্থান। শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তক শল্যায়ুর্বেদিক ধন্বন্তরিকর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সংকলন সুশ্রুতসংহিতা। কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য সুশ্রুত এই গ্রন্থের সংকলক। কারণ গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার 'নমো ব্রহ্মপ্রজাপত্যহ্বিবলভিদ্ধন্বন্তরিসুশ্রুত-প্রভৃতিভ্য:'— এরূপ বাক্যদ্বারা সুশ্রুতের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করেছেন। সুশ্রুত নিজেই যদি সংহিতাকার হতেন তবে তিনি নিজে নিজেকে নমস্কার করতেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুশ্রুত ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা পরবর্তীকালে এই সংহিতা সংকলিত হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গবেষকেরা মনে করেন যে, সুশ্রুত প্রণীত মূল 'সুশ্রুততন্ত্র' গ্রন্থটি কালবশে বিনষ্ট হওয়ায় নাগার্জুন তার সংস্কার সাধন করেন। নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত সেই গ্রন্থটিই সুশ্রুতসংহিতা।

নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত ও পরিমার্জিত সুশ্রুত সংহিতার প্রথমেই আছে সূত্রস্থান, যার অধ্যায় সংখ্যা ৪৬। নিদান স্থান ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত। শারীরস্থানের অধ্যায় সংখ্যা ১০। এই সংহিতার চিকিৎসা স্থানটি আকারে বৃহৎ, ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার বিবরণে সমৃদ্ধ। কল্পস্থানে আছে আটটি অধ্যায়। গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত উত্তরতন্ত্র।

১. সূত্রস্থান ঃ শল্য চিকিৎসাবিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ এবং ভেষজের শ্রেণীভেদ।

২. নিদানস্থান ঃ রোগের কারণ ও লক্ষণ নির্ণয়।

৩. শারীরস্থান ঃ মানবদেহের বিবরণ ও ভ্রূণতত্ত্ব।

৪. চিকিৎসাস্থান ঃ রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি।

৫. কল্পস্থান ঃ বিবিধ বিষ, তাদের প্রতিক্রিয়া ও চিকিৎসা।

৬. উত্তরতন্ত্র ঃ পরবর্তীকালের এই অংশে বিবিধ বিষয় সংযোজিত।

সুশ্রুতসংহিতার বিষয়সন্নিবেশ ব্যবস্থা সুসমৃদ্ধ এবং রচনারীতি অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। বিষপ্রয়োগের চিকিৎসায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে সর্পদষ্ট স্থানের চার আঙুল উপরে চর্ম, বল্কল বা বস্ত্রদ্বারা বন্ধন বিধেয়। রক্তমোক্ষণকেই সর্পদংশনের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলা হয়েছে— 'ফণিনাং বিষবেগে তু প্রথমে শোণিতং হরেত্'। পরে ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়।

সুশ্রুতমতে শল্য-প্রক্রিয়ার ৭টি ভেদ ঃ

ছেদন (amputation), ভেদন (excision), লেখন (scrapping), ব্রয্যন (probing), আহরণ (extracting), বিস্রবণ (drainage) ও সীবন (stiching)। এখানে অঙ্গসংস্থান (Plastic surgery), ত্বক্-অধিরোপণ (skin grafting) প্রভৃতির আলোচনাও পাওয়া যায়।

চরকসংহিতার ন্যায় সুশ্রুতসংহিতাও তৎকালীন ভিষগ্বর্গের দ্বারা বহুল সমাদৃত হয়েছিল। ভাষার সহজবোধ্যতা ও বিষয়োপস্থাপন পদ্ধতি গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

সুশ্রুতসংহিতারও বহু টীকা রচিত হয়েছিল। প্রাচীনতম টীকাকার জৈয়ট ও গয়দাস প্রসিদ্ধ। চক্রপাণিদত্তকৃত টীকার নাম ভানুমতী। অরুণদত্ত ও জল্পন যথাক্রমে খ্রী. ১৩শ ও ১৪শ শতকের টীকাকার।

আত্রেয়, হারীত ও সুশ্রুতের নামে 'বৃষ্যযোগ' (prescription of tonic) বিষয়ে নাবনীতক নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভেলসংহিতা ঃ

মহর্ষি আত্রেয়ের ছয়জন শিষ্যের মধ্যে ভেল অন্যতম। তাঁর রচিত 'ভেলতন্ত্র' বা 'ভেলসংহিতা' চিকিৎসাশাস্ত্রের অপর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার সঙ্গে এই গ্রন্থের গঠনগত সাদৃশ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সংহিতাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুসরণে রচিত। সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান— এই আটটি অংশে এবং ১১৩ অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। আলোচ্য বিষয় চরকসংহিতার অনুরূপ হলেও এর উপস্থাপনরীতি প্রাঞ্জল। বাগ্ভট এই সংহিতার অনেক প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।

আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগ্ভট তিনটি প্রধান আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।

বাগ্ভটের পরিচয় সম্বন্ধে অবশ্য মতান্তর আছে টীকাকারগণের মধ্যে। অনেকে 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-প্রণেতা বাগ্ভটকে প্রথম-বাগ্ভট বা বৃদ্ধ-বাগ্ভট নামে উল্লেখ করেন (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক) ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বাগ্ভটকে 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রণেতারূপে স্বীকার করার পক্ষপাতী। তবে নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের প্রস্তাবনায় বাগ্ভটবিমর্ণ অংস্এস উভয় বাগ্ভটকে অভিন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে।

গ্রন্থ তিনটি হল— অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয়।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ

অষ্টাঙ্গসংগ্রহে আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গই সংগৃহীত হয়েছে। বাগ্‌ভট নিজে কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থকে কায়চিকিৎসার গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন— 'संगृहीतं विशेषेन यत्र कायचिकित्सितम्'। গ্রন্থটি ছয়টি স্থানে বিভক্ত— সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরস্থান। সূত্রস্থানে সূত্রাকারে আয়ুর্বেদের পালনীয় কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে। শারীরস্থানে শরীরের ধর্মবিভাগ, শিরা-ধমনী প্রভৃতির বিভাগ প্রভৃতির বিভাগ ও কার্যকারিতা, মরণজ্ঞাপক রিষ্টলক্ষণ, গর্ভব্যাকরণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা আছে। নিদানস্থানে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লক্ষণ বা উপসর্গ। সকল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে চিকিৎসাস্থানে। কল্পস্থানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল পঞ্চ কর্ম চিকিৎসাবিধি। উত্তরস্থানে আছে শিশুরোগ চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, অস্থিভগ্নাদির চিকিৎসা, বিষচিকিৎসা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়

'অষ্টাঙ্গহৃদয়' বাগ্‌ভট প্রণীত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ অপেক্ষা এর রচনাশৈলী অনেক প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। হৃদয় যেমন শরীরের একদেশ হয়েও দশটি প্রধান শিরার দ্বারা সকল শরীরে ব্যাপ্ত, অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থটিও তেমনি সূত্র, শরীর, নিদান, চিকিৎসা, কল্পসিদ্ধি ও উত্তর— এই ছয়টি স্থান দ্বারা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিব্যাপ্ত—

हृदयमिव हृदयमेत् सर्वायुर्वेदवाङ्मयपयोधेः... ।। (८।८९) ॥

অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সকল স্থানই উৎকৃষ্ট, বিশেষ করে সূত্রস্থান তো সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষের নিদর্শন— 'निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने च वाग्भटः'। জ্বরাতিসার, শিশুচিকিৎসা, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা অনেক সমৃদ্ধ।

এই গ্রন্থের উপর রচিত চৌত্রিশটি টীকার অস্তিত্ব জানা যায়, যাদের মধ্যে অরুণদত্তকৃত সর্বাঙ্গসুন্দরা/সর্বাঙ্গসুন্দরী টীকা, হেমাদ্রিকৃত আয়ুর্বেদসায়নটীকা, চন্দ্রনন্দনকৃত পদার্থচন্দ্রিকা ইত্যাদি টীকা উল্লেখযোগ্য।

রসরত্নসমুচ্চয়

'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে রসায়ন ঔষধের সেবনবিধি বর্ণিত হয়েছে। বাগ্‌ভটের মতে যথাসময়ে রসায়নে ঔষধি সেবনে সুফল পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মোট ত্রিশটি অধ্যায় আছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে রাজযক্ষা এবং অর্শ রোগের চিকিৎসার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

চিকিৎসাসারসংগ্রহ

আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ'। এর রচয়িতা চক্রপাণি দত্ত। তিনি বাঙালী ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি এভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এর থেকে জানা যায় যে, চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ এবং অগ্রজের নাম ভানু। চক্রপাণি লোধ্রবলী বংশীয় কুলীন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নয়পাল গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ঐ সময়েই চক্রপাণি তাঁর এই গ্রন্থ রচনা করেন।

'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' গ্রন্থে রোগনির্ধারণ ও ধাতবদ্রব্যের গুণাগুণ আলোচিত হয়েছে। এটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ছাড়া চক্রপাণিদত্ত চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার টীকা রচনা করেছিলেন। টীকা দুটির নাম যথাক্রমে 'আয়ুর্বেদিকদীপিকা' ও 'ভানুমতী'।

'শব্দচন্দ্রিকা' এবং 'দ্রব্যগুণসংগ্রহ' নাম গ্রন্থদ্বয়ও তাঁর লেখনীপ্রসূত। 'শব্দচন্দ্রিকা' হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অভিধান। 'দ্রব্যগুণসংগ্রহে' আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া, পারদ প্রভৃতি ধাতুর গুণাগুণ ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা।

চক্রপাণিদত্তের গ্রন্থের উপর রচিত দুই টাকার চীকাকার—নিশ্চলকার ও শিবদাস।

বৌদ্ধযুগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

বৌদ্ধযুগে শল্যচিকিৎসা প্রায় অন্তর্হিত হলেও রসচিকিৎসা বহুধারায় প্রবাহিত হয়ে আয়ুর্বেদের স্বর্ণযুগকে সূচিত করে। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত বৌদ্ধদের কাছে রক্তপাত ছিল ধর্মবিরোধী। তাই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবপুষ্ট এমন কিছু আয়ুর্বেদাচার্য এসময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ধারাকে শল্যতন্ত্র থেকে মুক্ত করে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। উদ্ভব হয়েছিল রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের প্রথিতযশা দু'জন চিকিৎসক হলেন নাগার্জুন এবং জীবক।

রসচিকিৎসা বা রসায়নতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধ, জরা ও ব্যাধির বিনাশ, আয়ুবর্ধন, মেধাজনন প্রভৃতি। চরক ও সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসাস্থানের রসায়নাধ্যায়ে এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায়।

নাগার্জুনের 'রসার্ণবতন্ত্র', 'রসেন্দ্রমণ্ডলতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রসচিকিৎসা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জীবকের শিশুরোগ চিকিৎসার পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তরের সূচনা করেছিল।

নাগার্জুনের অবদান

আয়ুর্বেদাচার্য নাগার্জুনের প্রতিভাই বৌদ্ধযুগকে আয়ুর্বেদের স্বর্ণযুগে উন্নীত করেছিল। তিনি একাধারে আয়ুর্বেদের দার্শনিক ও স্মৃতিশাস্ত্র বিশারদ, বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের পথিকৃত্, বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত বৈয়াকরণ, লৌহশাস্ত্র বিশারদ, রাসায়নিক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদীয় শল্য ও শালাক্যতন্ত্রের সংস্কর্তা। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ তাঁর বিবিধদিগ্‌গামিনী প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লৌহশাস্ত্র, রসরত্নাকর, কক্ষপুটতন্ত্র, আরোগ্যমঞ্জরী, যোগসার, রসেন্দ্রমঙ্গল, রতিশাস্ত্র, রসকক্ষপুট এবং সিদ্ধনাগার্জুন। সকলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ঔষধ নির্মাণের প্রণালী পাটলিপুত্রে প্রস্তরগাত্রে স্তম্ভের উপর তিনি লিখে রাখতেন। যেমন— নাগার্জুনবর্তি, বিশ্বেশ্বরস, অভ্রবটিকা, রসাভ্রবটি, বৃহৎপানীয়, ভক্তবটিকা, মূলিকাবন্ধন, মৃতসঞ্জীবনী পুটিকা, কৃমিভদ্রবটী প্রভৃতি বহু আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী জনসাধারণের গোচরে এনে তিনি সমাজের মঙ্গল সাধন করেছেন।

পারদের অষ্টাদশ সংস্কার ও ধাতুবিদ্যার প্রবর্তন নাগার্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একের পর এক ধাতুকে গ্রাস করতে করতে পারদ আরও বুভুক্ষিত হয়। গ্রস্তধাতু পারদই অনেক অসাধ্য রোগ নিবারণ করতে

পারে। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে নাগার্জুন-কে পারদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। শুধু পারদ নয়, গন্ধক, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, শঙ্খ, সীসা, হীরক, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুকে বিভিন্ন ক্ষতরোগে ব্যবহারের বিশেষ বিধি যে বৌদ্ধযুগে আবিষ্কৃত হয় তার মূলেও নাগার্জুনের অবদান কম নয়। এর ফলে অস্ত্রচিকিৎসার পরিবর্তে কেবল রসৌষধি প্রয়োগের মাধ্যমে ফোঁড়া, বিষফোঁড়া, অর্বুদ, সদ্যব্রণ প্রভৃতির চিকিৎসাধারা ভিন্নমুখে প্রবাহিত হয়। ফলে বৌদ্ধযুগে অর্বুদ, ভগ্নাদি, ক্ষতোদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্থ, ভগন্দর প্রভৃতি ব্যাধি বিনা অস্ত্রোপচারে নিরাময়ের উপায় উদ্ভূত হয়। চক্ষু চিকিৎসার জন্য নানা ধরনের প্রলেপ, কাজল, শলাকা, অশ্চোতন, বর্তি প্রভৃতির প্রয়োগ বৌদ্ধযুগেই শুরু হয়।

জীবকের অবদান

বৌদ্ধ চিকিৎসক বৈদ্যরাজ জীবকের আবির্ভাব আর আয়ুর্বেদের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর জন্মস্থান রাজগৃহ বা রাজগীর। তাঁর রচিত 'জীবকতন্ত্র' কৌমারভৃত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জীবক ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রী পূ ষষ্ঠ শতকে। তিনি মহারাজ বিম্বিসার ও ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের সমস্ত শাখায় নিষ্ণাত ছিলেন। আয়ুর্বেদের সর্ববিদ্যায় বিশারদ হয়ে জীবক তক্ষশীলা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগরীতে ব্যাধিপীড়িত বণিকদের দুরারোগ্য অনেক ব্যাধি থেকে মুক্ত করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কথিত আছে যে, সাকেত নগরীতে সে সময় এক সম্ভ্রান্ত বণিক দীর্ঘ সাত বৎসর কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করেছিলে। তরুণ বৈদ্য জীবক ঘৃতের নস্যপ্রয়োগের দ্বারা তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করেন।

তক্ষশীলার শল্যচিকিৎসক ভিক্ষু আত্রেয়ের নিকট জীবক শল্যবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিরঃকপাল উৎপাটনপূর্বক অস্ত্রোপচারে জীবক বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Cranial Surgery.

শিশুরোগের চিকিৎসাতেও জীবক ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর 'জীবকতন্ত্রে' শিশুরোগ ও গর্ভিনীরোগ চিকিৎসার বিভিন্ন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। অভিনব পদ্ধতিতে জীবকের শিশুরোগ চিকিৎসা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। জগতের সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম যে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতে পারে একথা জীবকই প্রথম ঘোষণা করেন। বৌদ্ধযুগে একদিকে যেমন নাগার্জুন সম্প্রদায়ের দ্বারা পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি প্রয়োগ রসচিকিৎসাকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করেছিল, অপরদিকে তেমনি জীবক ও তাঁর অনুগামীদের ভেষজ গবেষণার ফলে আয়ুর্বেদীয় বনৌষধিসমূহের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আয়ুর্বেদের ক্রমাবনতি

ভারতবর্ষে উদ্ভূত ও পরিশীলিত যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এককালে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, বর্তমানে তাঁর ক্রমাবনতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এর মূলে কতকগুলি কারণ আছে। কোন সামাজিক শাস্ত্রের উন্নতি ও প্রসার নির্ভর করে সমাজের স্থিতিশীলতার উপর। ভারতবর্ষের সম্পদের লোভে এদেশে বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করেছিল। পাঠান ও মুঘল রাজত্বকালে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয় নি। আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে মুঘল বাদশাহদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

ব্রিটিশ রাজশক্তির করাল গ্রাসে গ্রস্ত ভারতভূমিতে আয়ুর্বেদের অবনতি আরও ত্বরান্বিত হয়। ১৯০ বছরের ইংরেজ রাজত্বকালে আয়ুর্বেদের কোন উন্নতি তো হয়ই নি। এসময় আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে লোক-দেখানো অনেক কমিটি গঠিত হলেও কোন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তার পরিবর্তে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাসকবর্গ সচেষ্ট ছিল। ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো মেডিকেল কলেজ। আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য প্রবল হলো। আয়ুর্বেদের পরিবর্তে এলোপ্যাথির প্রতিষ্ঠা স্থিরীকৃত হল। কলিকাতাতেও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শবব্যবচ্ছেদব্যবস্থা যেন পূর্ণাহুতি দিল আয়ুর্বেদের নিধনযজ্ঞে।

ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। অনেকে আশা করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণের সদিচ্ছায় আয়ুর্বেদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধৃত হবে। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের সেই আশা মিথ্যা মরীচিকায় পর্যবসিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য যে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সরকারি ঔদাসীন্যে সেগুলির আজ প্রাণান্তকর অবস্থা। এরই মধ্যে গণনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী, যামিনীভূষণ রায় প্রমুখ আয়ুর্বেদবিদ্যার গহন তমিস্রায় আশার আলোক জ্বালাতে চেষ্টা করলেও তাঁদের সেই প্রয়াস সুদূরপ্রসারী হয়নি। আশ্বাসের বিষয়, ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে আয়ুর্বেদ চিকিত্সা বর্তমানে বেশ প্রচলিত হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র যে পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির পথিকৃৎ এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে কোন চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর আয়ুর্বেদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যৎ-এ আয়ুর্বেদের মরা গাঙে আবার জোয়ার আসবে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ‘‘ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।’’

ইতিহাসের উপাদানরূপে অভিলেখ

মিলি মাজী

ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিকে একত্রে ইতিহাসের উপাদান বলে। ইতিহাস রচনার যেমন সাহিত্যিক উপাদান রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেও যথার্থ ইতিহাস রচনার কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। ইতিহাসের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে প্রাচীন অভিলেখগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর খণ্ড, ঘরবাড়ি বা মন্দিরের গায়ে লিখিত প্রচুর প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতিহাসবিদ্ **ভিনসেন্ট স্মিথ** বলেছেন যে, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে লেখগুলির গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বাধিক। এর কারণ হল—

অবিকৃত উপাদান ঃ— লেখগুলি বিভিন্ন ধাতু, পাথর প্রভৃতির ওপর খোদিত হয় বলে এগুলি অন্যান্য উপাদানের মতো প্রাকৃতিক কারণে সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। তাই লেখ থেকে তুলনামূলকভাবে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব।

পক্ষপাতহীন উপাদান ঃ— ইতিহাসের অন্য উপাদানগুলি দীর্ঘকাল ধরে নানা হাতে পড়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পুরাণ বা অন্যান্য সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কাল্পনিক ও পক্ষপাতমূলক বহু তথ্য এগুলিতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু শিলালেখর ক্ষেত্রে সেই ধরণের বিকৃতি ঘটা সম্ভব হয় না। ফলে লেখগুলিকে প্রাচীন যুগের তুলনামূলক পক্ষপাতহীন উপাদান হিসেবে গণ্য হয়।

সময়কাল নির্ণয়ে ঃ— লেখগুলিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার আকৃতি ও বিবর্তন থেকে তার সন-তারিখ অনুমান করা যায়। কোনটি আগের আর কোনটি পরের তা বিভিন্ন যুগের লেখর তুলনামূলক বিচারে নির্ণয় করা সম্ভব।

রাজ্যসীমা নির্ণয়ে ঃ— লেখর প্রাপ্তিস্থান থেকে রাজাদের রাজ্যসীমা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। যেমন— অশোকের লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

যথার্থ তথ্য প্রদানে ঃ— প্রাচীন রাজকাহিনিগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে লিখিত হয় বলে তাতে অনেক কাল্পনিক ঘটনা লেখবদ্ধ হয়। কিন্তু লেখগুলি জনগণের সামনেই স্থাপন করা হত বলে এতে কাল্পনিক কাহিনি যুক্ত হওয়া কঠিন ছিল। অর্থাৎ সাহিত্য অপেক্ষা শিলালেখতে অনেক যথার্থ তথ্য পাওয়া সম্ভব।

শাসনবিষয়ক তথ্য প্রদানে ঃ— বিভিন্ন রাজা বা রাজবংশের অভিলেখগুলি থেকে সে যুগের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয় নির্দেশ, মন্দির নির্মাণ, ভূমিদান, ধর্মপ্রচার, বিশেষ কোনো স্মরণীয় ঘটনা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

শিল্প-উৎকর্ষ সম্বন্ধে জানতে ঃ— লেখতে ব্যবহৃত পাথর থেকে সে যুগের ভাস্কর্যশিল্পের এবং ধাতু থেকে সে যুগের ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে জানা যায়।

বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে ঃ— বিদেশে প্রাপ্ত অভিলেখগুলি থেকে সমকালীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে লেখ যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই। ইতিহাসবিদ্ **ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার** বলেছেন যে, প্রাচীন ভাতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অভিলেখ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসবিদ **ফ্লিট** বলেছেন যে, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা প্রভৃতি থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার সভ্যতা নির্ণয়ে লেখগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

মান্দাসোর অভিলেখ

প্রাপ্তিস্থান ঃ— মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোরে সিওয়ানা নদীর মহাদেব ঘাটে সিঁড়ির সারির দক্ষিণদিকের দেওয়ালে গাঁথা একটি পাথরে প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ ছিল। পরে এটিকে গোয়ালিয়র সংগ্রহশালায় রাখা হয়।

সময়কাল ঃ- ৪৯৩ অথবা ৫২৯ মালব সংবৎ অর্থাৎ ৪৩৬ অথবা ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত।

লেখক ঃ- মান্দাসোর অভিলেখের রচয়িতা হলেন বৎসভট্টি নামক জনৈক কবি।

পৃষ্ঠপোষক ঃ- কবি বৎসভট্টি কোনো গুপ্তরাজার সভাকবি ছিলেন না। শ্রেণ্যাদেশে তৎকর্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হয়। রেশম শিল্পী গোষ্ঠীরাই এই অভিলেখের পৃষ্ঠপোষক।

ভাষা ঃ- এই অভিলেখের ভাষা হল সংস্কৃত। রচনারীতির উৎকর্ষ বিচারে সমকালীন সংস্কৃত লেখমালার মধ্যে মান্দাসোর প্রশস্তি সর্বশ্রেষ্ঠ। কবি বৎসভট্টি দ্বারা ৪৪টি শ্লোকে প্রযত্ন সহকারে রচিত এই অভিলেখ সালঙ্কার শিষ্ট কাব্যের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। এর ভাষা ও চিত্রকল্পে কালিদাসের মেঘদূতের প্রভাব অতি স্পষ্ট।

লিপি ঃ- এই অভিলেখের লেখ হল দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মীর পশ্চিমদেশীয় শৈলী।

রচনাশৈলী ঃ- বৎসভট্টির রচনাশৈলীর নিদর্শন—

विलोलवीचीचलितारविन्द-पतद्रज:पिञ्जरितैश्च हंसै:।
स्वकेसरोदार-भरावभुग्नै: क्वचित्सरांस्यम्बुरुहैश्च भान्ति।। ८।।
चलत्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि।
तडिल्लता-चित्र-सिताभ्र-कूट-तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र।। १०।।

বিষয়বস্তু ঃ- লাটদেশ থেকে পট্টবায় অর্থাৎ রেশমশিল্পীদের একটি গোষ্ঠী দশপুর (মান্দাসোর) নগরে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা নানা রকম জীবিকা আশ্রয় করেছিল। সূর্যদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ তারা দশপুরে সূর্যমন্দির নির্মাণ করে। ঐ সময় প্রথম কুমার গুপ্তের সামন্ত রাজা বন্ধুবর্মা দশপুর শাসন করেছিলেন। ৪৯৩ মালবাব্দে এই দেবায়তন নির্মিত হয়। কালক্রমে ঐ প্রাসাদের একটি অংশ জীর্ণ হয়ে গেলে ৫২১ মালবাব্দে তার সংস্কার করা হয়।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ ১) প্রাচীন ভারতবর্ষের রেশম বয়ন শিল্পের উপর এই অভিলেখ আলোকপাত করে। ভারতবর্ষে পট্টবয়নশিল্প সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন। তার সুদৃঢ় প্রমাণ মহারাষ্ট্রের নেভাসা প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন থেকে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে যে পট্টশিল্প দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার প্রমাণ আলোচ্য অভিলেখ থেকে পাওয়া যা। ২) প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় শ্রেণীসমূহের কার্যকলাপও এই অভিলেখ থেকে জানা যায়।

ভারতবর্ষের শিল্প, কারুকর্ম প্রভৃতির উন্নতি বহুলাংশে শ্রেণীগুলির উপর নির্ভর করত। ৩) এই অভিলেখের রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এখানে স্পষ্টতঃ প্রশাসন যন্ত্রে সামন্তায়নের ইঙ্গিত রয়েছে। রামশরণ শর্মা গুপ্তযুগ থেকেই সামন্ততন্ত্রের লক্ষণগুলিকে বিশেষভাবে সমীক্ষণ করেছেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পরিধিস্থিত অঞ্চলগুলিতে সামন্তগণ সম্রাটের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। এই অভিলেখেও তার প্রমাণ রয়েছে। যদিও এখানে (প্রথম) কুমার গুপ্তের শাসনকাল উল্লিখিত হয়েছে, তবু নিঃসন্দেহে সামন্তপ্রাধান্যের ব্যাপারটি বোঝা যায়। সম্রাট কুমারগুপ্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর বংশসারণীরও কোনো উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে দশপুরের শাসক বন্ধুবর্মা রাজা বিশ্ববর্মার পুত্র। এঁরা দুজনে দশপুরের স্থায়ী শাসক ছিলেন। এঁদের দুজনের সম্বন্ধে সামন্তদের সাধারণ উপাধিভূত নৃপ ও গোপ্তা এই দুই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

আইহোল প্রশস্তি

প্রাপ্তিস্থান ঃ কর্ণাটক রাজ্যের বিজাপুর জেলার হুন্‌গুন্দ্‌ তালুকে অবস্থিত আইহোল। সেখানে মেগুতি মন্দিরের একটি প্রস্তরফলকে ঊনিশ পঙ্‌ক্তির এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

সময়কাল ঃ ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইহোল প্রশস্তি রচিত হয়েছিল।

লেখক ঃ এই প্রশস্তি জৈন কবি রবিকীর্তির রচনা।

পৃষ্ঠপোষক ঃ চালুক্য বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী এই প্রশস্তির পৃষ্ঠপোষক।

ভাষা ঃ আইহোল প্রশস্তির ভাষা হল সংস্কৃত।

লিপি ঃ আইহোল প্রশস্তি কন্নড় লিপিতে রচিত।

বিষয়বস্তু ঃ চালুক্য বংশের পুরুষাণুক্রম বর্ণনার পর ঐ বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কীর্তিকাহিনীকে কবি শিষ্ট কাব্যসুলভ সালঙ্কার রীতিতে পরিবেশন করেছেন। জৈন কবি রবিকীর্তি অভিলেখের শেষে জানিয়েছেন যে জিনের এই আলয় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রশস্তি তাঁরই রচনা।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ এই অভিলেখ থেকে জানা যায় চালুক্যদের সাধারণ বিরুদ বা উপাধি ছিল পৃথিবীবল্লভ। এই অভিলেখে চালুক্য বংশের যে প্রাচীন রাজারা উল্লিখিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জয়সিংহ ও রণরাগের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। আলোচ্য অভিলেখে বলা হয়েছে—

প্রতাপোপনতা যস্য লাটমালবগুর্জরা:।
দণ্ডোপনতসামন্তাচর্যাচার্যা ইবাভবন্‌।। ২২।।

এই উক্তি থেকে মনে হয় এঁরা কৌটিল্যকথিত দণ্ডোপনত সামন্ত ছিলেন। এই সামন্তগণ ভৃত্যভাবি সামন্তের বিশেষ একটি প্রকার। শ্রীমূলা টীকায় বলা হয়েছে ''স্বয়মুপনত: স্বয়মেবোপগম্যাশ্রয়ী প্রতাপোপনতো বা প্রতাপপ্রণতো বেতি দ্বিরূপো দণ্ডোপনত ইতি।''

পুলকেশীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করা। প্রশস্তিতে বলা হয়েছে—"**भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः।**"

এলাহাবাদ প্রশস্তি

প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রথমে এই ৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভটির অবস্থান ছিল উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী অর্থাৎ বর্তমান কোশামে। পরে এটিকে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘ্লক এর বর্তমান অবস্থান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ দুর্গে নিয়ে আসেন। এর গায়েই সম্রাট অশোকের কৌশাম্বী অনুশাসন ও দেবী অনুশাসন উৎকীর্ণ।

সময়কাল ঃ এই প্রশস্তিটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩৫০ শতক বা তার সমসাময়িককালে রচিত বলে মনে করেন পণ্ডিতগণ।

লেখক ঃ এলাহাবাদে প্রাপ্ত এই এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হলেন হরিষেণ।

পৃষ্ঠপোষক ঃ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বর্ণনা নিয়ে এই এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা হয়েছিল। অতএব, এলাহাবাদ প্রশস্তির পৃষ্ঠপোষক হলেন গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

ভাষা ঃ কবি হরিষেণ এই প্রশস্তি সালঙ্কার সংস্কৃত ভাষায় আংশিক পদ্যে এবং আংশিক গদ্যে রচনা করেন।

লিপি ঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এই অভিলেখের লেখকে উত্তরকালীন উত্তর ভারতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মী বলে নির্দেশ করেছেন।

রচনাশৈলী ঃ আলোচ্য প্রশস্তির ব্রাহ্মী লেখতে সেই বিচারে আদিগুপ্ত যুগের কৌশাম্বী শৈলী লক্ষণীয়।

বিষয়বস্তু ঃ প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রশংসাই এর প্রতিপাদ্য। তাঁর শৌর্য-বীর্য, তাঁর দিগ্বিজয়, তাঁর রাজকীয় ও আভিগামিক গুণাবলী, বংশপরিচয় এই সব কিছু চলচ্চিত্রবৎ চিত্রণের শেষে রয়েছে প্রশস্তির ধারক স্তম্ভটির সালঙ্কার উল্লেখ ও কবির বিনীত আত্মপরিচয়। কবির কথায় সমুদ্রগুপ্তের সান্নিধ্যই তাঁর বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়েছে। অন্তিম পঙ্ক্তিতে প্রশস্তির দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষের নাম হল মহাদণ্ডনায়ক তিলভট্টক।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ এলাহাবাদ প্রশস্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রশস্তিটি মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনচিহ্নিত স্তম্ভে উৎকীর্ণ। আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের পরাজিত করে যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্বর্গাভিযায়ী যশ লাভ করেছিলেন তাঁর মহিমা অশোককেও অতিক্রম করে গেছে এটা দেখানোর উপায় হিসেবে এই স্তম্ভকে তাঁর প্রশস্তির আধার করা হয়েছিল।

এই অভিলেখের শেষের দিকে ২৮-২৯ পঙ্ক্তিতে সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয় বিধৃত রয়েছে।

এই অভিলেখের চতুর্থ শ্লোকটি ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রদেরই পিতার পর রাজপদে অভিষিক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই নিয়ম যে সবসময়

অনুসৃত হত তা নয়।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছেন। ভারত ইতিহাসের এই যুগান্তকারী ঘটনাটি এই শ্লোকে চিত্রিত। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না, যার ফলে সিংহাসনের দাবিদার অন্যান্য রাজপুত্র ও সভাসদ্‌দের সাক্ষাতে তাঁর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এই প্রশস্তির অন্যতম প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

রাজ্যজয়ের বর্ণনা ঃ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তকে 'শতযুদ্ধের নায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রশস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

(i) উত্তর ভারত জয় ঃ– সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পূর্বসূরী মহাপদ্মনন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো উত্তর ভারতে 'দিগ্‌বিজয় নীতি' গ্রহণ করেছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের নয়জন বিখ্যাত রাজাকে পরাজিত করেন। পরাজিত রাজ্যগুলিকে তিনি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে সেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন চালু করেন। এই নয়জন রাজা হলেন—(১) রুদ্রদেব, (২) মতিল, (৩) নাগদত্ত, (৪) চন্দ্রবর্মন্, (৫) গণপতি নাগ, (৬) অচ্যুত, (৭) নাগসেন, (৮) নন্দিন্, (৯) বলবর্মন্। এইসব রাজারা মোটামুটিভাবে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য ভারতের কিছু অংশ ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে রাজত্ব করতেন।

(ii) দক্ষিণ ভারত জয় ঃ উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করলেও দক্ষিণ ভারতের বারোটি রাজ্যকে পরাজিত করে তিনি পরাজিত রাজাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর এই পৃথক্ নীতি 'গ্রহণ পরিমোক্ষ' বা 'ধর্মবিজয় নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতির তিনটি অংশ ছিল—(১) 'গ্রহণ' অর্থাৎ রাজ্যজয় ও শত্রু রাজাকে বন্দী করা। (২) 'মোক্ষ' অর্থাৎ পরাজিত রাজাকে মুক্তিদান। (৩) 'অনুগ্রহ' অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে পরাজিত রাজার রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া। অবশ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেও পরাজিত রাজাকে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেননি। সমুদ্রগুপ্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসন চালানো সম্ভব নয়। তাই তিনি সেখানকার রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে দেন।

মূল্যায়ন ঃ হরিষেণ যেহেতু সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন সেহেতু তাঁর বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্পর্কে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। ইতিহাসবিদ্ জি. ডি. কোশাম্বী মনে করেন যে, এলাহাবাদ প্রশস্তির ছত্রে ছত্রে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের প্রকাশ দেখা যায়।

মেহরৌলি স্তম্ভলেখ

প্রাপ্তিস্থান ঃ নূতন দিল্লি থেকে ৯ মাইল দক্ষিণে মেহরৌলিতে কুতুবমিনারের কাছে কুব্বত-উল্-ইসলাম মসজিদে শুণ্ডাকৃতি লৌহস্তম্ভে এই অভিলেখটি উৎকীর্ণ আছে। মেহরৌলির প্রাচীন নাম ছিল মিহিরপুরী। এই স্তম্ভটির অবশ্য প্রথমে মিহিরপুরীতে ছিল না। বিষ্ণুপদগিরিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে কোনো এক উৎসাহী রাজা এটিকে দিল্লিতে নিয়ে আসেন।

সময়কাল ঃ মেহরৌলি লৌহস্তম্ভলেখ ৩৭৫ থেকে ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল।

লেখক ঃ এই লৌহস্তম্ভলেখ অনামা কবি চন্দ্র নামক রাজার প্রতাপ বর্ণনা করতে গিয়ে চমৎকারভাবে বিভিন্ন অলঙ্কারের সাঙ্কর্য নির্মাণ করেছিলেন।

পৃষ্ঠপোষক ঃ চন্দ্র নামক রাজা হলেন এই লৌহস্তম্ভলেখর পৃষ্ঠপোষক। বর্তমানে বিভিন্ন দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এই চন্দ্র আসলে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৫–৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভাষা ঃ এই প্রশস্তির অনামা কবি বৈদর্ভী রীতিতে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

লিপি ঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরকালীন ব্রাহ্মীলিপিতে এটি লেখা হয়েছিল। গুপ্তযুগীয় ব্রাহ্মীর যে শৈলী মথুরা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এই লেখ তারই প্রতিনিধি।

রচনাশৈলী ঃ এই অভিলেখে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা তিনটি শ্লোক রয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও অভিলেখটি উত্তম কাব্যরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে উৎপ্রেক্ষা-উপমা, অতিশয়োক্তি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট। এই ক্ষুদ্র পরিসরে অনুকূল শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বীররসের সার্থক প্রকাশও ঘটেছে।

বিষয়বস্তু ঃ 'চন্দ্র' নামধারী কোনো এক রাজার প্রশস্তি এই অভিলেখে পাওয়া যাচ্ছে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে এটি তাঁর মরণোত্তর প্রশস্তি। অভিলেখের দ্বিতীয় শ্লোকটির উপর ভিত্তি করে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বালসুব্রমনিয়ম্ ও প্রভাকর Current Science গবেষণা পত্রিকার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন-মুদ্রা ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ঐ প্রশস্তি মরণোত্তর হতে পারে না। যদিও দীনেশচন্দ্র সরকার এটিকে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরেই রচিত এবং তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎকীর্ণ বলে দাবি করেন।

চন্দ্রের প্রতাপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—তাঁর বাহুতে খড়্গের দ্বারা তাঁর যশ খোদিত হয়েছিল অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রাঘাতে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্নগুলি তাঁর যশ ঘোষণা করত। বঙ্গদেশের যুদ্ধাঙ্গনে শত্রুদের সমবেত আক্রমণকেও তিনি অনায়াসে প্রতিহত করেছিলেন। সিন্ধুনদের সপ্তমুখ অতিক্রম করে তিনি বাহ্লীক জয় করেছিলেন। দক্ষিণসমুদ্রও তাঁর কীর্তিসৌরভে ব্যাপ্ত হয়েছিল। স্তম্ভটি গুপ্তযুগের ধাতুবিদ্যার চরম উৎকর্ষের সাক্ষী। এতে অদ্যাবধি মরচে পড়েনি। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, স্তম্ভটি জ্যোর্তিবিদ্যার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তাঁদের মতে, বিষ্ণুপদগিরি হল-বিদিশা ও সাঁচীর সন্নিকটস্থ উদয়গিরি। স্থানটি কর্কটক্রান্তিরেখার ঠিক উপরে অবস্থিত। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় প্রভাতকালে এই স্তম্ভের ছায়া ১৩ নম্বর গুহায় অনন্তশয়ন বিষ্ণুর পদমূল স্পর্শ করত।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ এক সময় এই অভিলেখে উল্লিখিত চন্দ্রাহ্ব অর্থাৎ চন্দ্র নামধারী রাজার পরিচয় বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা গেছে যে, এই চন্দ্র আসলে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৫–৪০৫)। গুপ্তসম্রাটদের (৩২০–৬০০ খ্রীঃ) তীরন্দাজ প্রতিকৃতিযুক্ত মুদ্রাসমূহের বিশদ ধাতুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই লেখর কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক ধরা হয়েছে। লিপিতত্ত্বের দিক থেকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই অভিলেখের অক্ষরগুলি গুপ্তযুগীয় ব্রাহ্মীর আগে

হওয়া সম্ভব নয়। আবার লৌহস্তম্ভের মাথায় যে কারুকার্যময় ঘণ্টা রয়েছে তার উচ্চতম বেদীর মূর্তিটি উদয়গিরির ৬ নম্বর গুহায় একটি ব্যাস-রিলিফ (যেন পটভূমির মধ্যে গাঁথা রয়েছে এমন ভাস্কর্য)-এও দেখা যায়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় স্তম্ভটি এক সময় বিষ্ণুপদগিরি বা ইদানীন্তন উদয়গিরিতে ছিল। ঐ গুহায় পাওয়া তারিখযুক্ত সনকানীক অভিলেখ থেকে ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে এটির ঐ স্থানে অবস্থানের বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

প্রথম রুদ্রদামার জুনাগড় প্রশস্তি

প্রাপ্তিস্তান ঃ গুজরাতের জুনাগড় নগর থেকে মাইল খানেক পূর্বে গির্ণার পাহাড়। তার পশ্চিম পাশের গায়ে চূড়ার প্রায় কাছাকাছি এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ঐ পাহাড়েই অশোকের গির্ণার অনুশাসনগুলি ও স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তি খোদিত আছে।

সময়কাল ঃ এই অভিলেখ অনুযায়ী সুদর্শন হ্রদের সেতু ৭২ শকাব্দের মার্গশীর্ষ মাসে বিদীর্ণ হয়। ৭২ শকাব্দ অর্থাত্ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। মার্গশীর্ষ মাস অর্থাত্ অগ্রহায়ণ। ১৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হবার পরে প্রশস্তিটি লেখা হয়েছিল।

পৃষ্ঠপোষক ঃ শকক্ষত্রপ রুদ্রদামা হলেন এই জুনাগড় প্রশস্তির পৃষ্ঠপোষক।

ভাষা ঃ এই প্রশস্তিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ওজোগুণান্বিত দীর্ঘসমাসবহুল গদ্যে লেখা এই অভিলেখের ভাষাকে উত্তরকালীন গদ্যকাব্যের পূর্বসূরী বললে অত্যুক্তি হবে না।

লিপি ঃ বুহ্লার-এর মতে এই অভিলেখের অক্ষরগুলি দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালার পূর্বসূরী।

রচনাশৈলী ঃ এই লেখর মধ্যে নিহিত আছে কাব্যরচনার উৎকর্ষের নিদর্শন। সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার, অলঙ্কার প্রয়োগের সৌন্দর্য এই অভিলেখকে উচ্চ কাব্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ কিছু কিছু পদসন্নিবেশ থাকলেও অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার, উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের সুচারু প্রয়োগ সকলকে বিস্মিত করে।

বিষয়বস্তু ঃ সুদর্শন হ্রদের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সেতু অর্থাৎ বাঁধের পুনর্নির্মাণ এই প্রশস্তির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। মহাক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামার শাসনকালে ৭২ শকাব্দে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতে সুদর্শন হ্রদের বাঁধটি ভেঙে যায়। এই বাঁধটি যথেষ্ট প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বৈশ্য পুষ্যগুপ্তকে দিয়ে এটি নির্মাণ করেছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। পরে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় যবনরাজ তুষাস্ফের তত্ত্বাবধানে এই বাঁধের সঙ্গে প্রণালী যুক্ত করা হয়। রুদ্রদামার সময় ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত এই বাঁধের জীর্ণোদ্ধার সম্পন্ন হবার পর প্রশস্তির বর্ণনা অনুযায়ী এটি অতি চমৎকার অবস্থায় বর্তমান ছিল। '**महत्युपचये वर्तते**'। প্রসঙ্গতঃ এই অভিলেখ রুদ্রদামার বংশ পরিচয়, গুণাবলী, দিগ্বিজয়, সুশাসকত্ব ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ রুদ্রদামার প্রশস্তি অনুযায়ী ফাটলটির পরিমাপ ছিল দৈর্ঘ্যে ৪২০ হাত, প্রস্থে ৪২০ হাত, গভীরতায় ৭৫ হাত। সাধারণ মানুষ এই আকস্মিক বিপৎপাতে উদভ্রান্ত ও বিষণ্ণ হয় ''**पुनः सेतुबन्धनैराश्यादाहाभूतासु**''

(রুদ্রদামার প্রশস্তি), ''**विषाद्यमानाः खलु सर्वतो जनाः कथं कथं कार्यमिति प्रवादितः।**' (স্কন্দগুপ্তের প্রশস্তি)

এই হ্রদের উৎপত্তি কিভাবে হল সে বিষয় শুধু অভিলেখের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। অন্যান্য আকর ও এর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থিতির পর্যালোচনাও এ প্রসঙ্গে করতে হয়। এই হ্রদের উৎপত্তির পশ্চাতে প্রাকৃতিক ভূগোলের তিনটি উপাদান আছে —পর্বত, নদী ও গিরিখাত। একই অঞ্চলে দুটি বিখ্যাত পর্বতের অবস্থান ছিল ঊর্জয়ৎ ও রৈবতক। অনেক সময় এদের অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হলেও আসলে এরা দুটি পৃথক্ পর্বতই ছিল। তার প্রমাণ স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রশস্তি।

প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এভাবে যে অভিলেখগুলি বিভিন্ন সময়ে অভিলিখিত হয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পুনর্নির্মাণে ঐ অভিলেখগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Citation Bibliography

Books:

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Sanskrita Sahityer Itihas*. Kolkata : West Bengal State Book Board, 2018. (8th rpt. 2nd ed.)

Caraka. *Caraka-saṃhitā*. With comm. *Āyurvedadīpikā* by Cakrapāṇidatta and *Jalpakalpataru* by Gaṅgādhara. Ed. Narendranath Sengupta and Balaichandra Sengupta. Vol. 1. Kolkata , 1849 Śaka. (1927 CE).

____. _____. _____. Vol. 2. _____. 1850 Śaka (1928 CE).

Kālidāsa. Complete Works. Ed. Revaprasad Dvivedi. *Kālidāsa-granthāvalī*. Varanasi : BHU, 1976.

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary*. Delhi : MLBD, 2011. (16th rpt. ; 1st ed. Oxford University Press, 1899).

Pāṇini. *Aṣṭādhyāyī*. Ed. Sankararama Sastri. *Aṣṭādhyāyī-sūtrapāṭha*. Rev. ed. Ratna Basu. Delhi : Sharada Publishing House, 1994. (1st ed. 1937).

e-books:

Bharata. *Nāṭyaśāstra*. Ed. Kedarnath Sahityabhushan. Bombay (now Mumbai) ; Nirnaya-Sagar Press, 1943. (2nd ed.) (*Kāvyamālā No. 42*).

Kālidāsa. *Ṛtusaṃhāra*. With comm. *Candrikā* by Maṇirāma. Mumbai ; 1844 Śaka (1922 CE).

Kālidāsa. *Meghadūta.* With comm. *Saṃjīvanī* by Mallinātha. Mumbai ; 1934. 3rd ed. (rvsd).

Maxmüller. *The First Book of the Hitopadeśa*. With Sanskrit Text, Interlinear translation, grammatical analysis and English translation. London , 1864.

Śārṅgadeva. *Saṅgītaratnākara*. With comm. *Kalānidhi* of Kallinātha and *Sudhākara* by Siṃhabhūpāla. Ed. S. Subramanya Sastri. Vol. 1. Madras (now Chennai) ; The Adyar Library. 1943.

Śārṅgadeva. *Saṅgītaratnākara*. With comm. *Kalānidhi* of Kallinātha and *Sudhākara* by Siṃhabhūpāla. Ed. S. Subramanya Sastri. Vol. 2. Madras (now Chennai) ; The Adyar Library. 1944.

Śārṅgadeva. *Saṅgītaratnākara*. With comm. *Kalānidhi* of Kallinātha and *Sudhākara* by Siṃhabhūpāla. Ed. S. Subramanya Sastri. Vol. 3. Madras (now Chennai) ; The Adyar Library. 1951.

Online references :

- Anandashram Sanskrit Series (AnandaXshram Samskrita Granthavali) | Sanskrit eBooks
- Natya Shastra Sanskrit Text : Pandit Kedarnath Sahityabhushan : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- Rigveda in Devanagari and Transliteration with Translation into English and German (sanskritweb.net)
- Sangita Ratnakara : Sarangadeva, Srangadeva, Shrangadeva : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- The Ritusamhara Of Kalidasa : Shastri,sudeva Laxman : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
- The first book of the Hitopadesa : containing the Sanskrit text with interlinear translation, grammatical analysis, and English translation : Müller, F. Max (Friedrich Max), 1823-1900 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Abbreviations

श्री:/ श्री. = श्रीष्टाब्द

स.र. = संगीतरत्नाकरः

सा.द. = साहित्यदर्पणः

सिद्धि = सिद्धिस्थानम्, चरकसंहिता

A.D. = anno Domini

BHU = Benaras Hindu University

CE = Christian Era

Comm. = Commentary / Commentator / Commentators

Ed. / ed. = Edited / Editor/ Edition

HSL = History of Sanskrit Literature

P/p = Page

Pp = Pages

Pā = Pāṇini

Rpt./ rpt. = Reprint

Rev./ rvsd = Revised

Trans. / trans. = Translation / translated/ translator

Contributors :

Chief Editor : Dr. Arundhati Das. Head, Department of Sanskrit

Assistant Editor : Prof. Vivek Karmakar. Faculty, Department of Sanskrit

DTP, Graphics and Design : Mr. Samrat Paul

Faculty Advisors : Dr. Indrani Kar, Dr. Debashis Ghosh